স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক

এম বাহাউদ্দিন

email: probashi_writer@yahoo.ca

এম. বাহাউদ্দিনের উপন্যাস 'স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক' ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি প্রতি রবিবার। ১০ টি পর্বে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসটির পর্ব-৪ আজ রবিবার, মার্চ ২৬, ২০০৫ এ প্রকাশিত হলো। আপনার মতামত লেখককে জানান এই ঠিকানায়ঃ probashi_writer@yahoo.ca –সম্পাদক

৪র্থ পর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

-২৪-

আনিসের তিন মাস শেষ। এবার চাচা চাচীর মোকাবেলায় বসতে হবে। বলতে হবে কি করবে। এই তিন মাসে আনিস বুঝতে পেরেছে এখানকার জীবন ধারা, বাঙালীর চালচলন, জীবিকার প্রধান গলি। সে বুঝতে পেরেছে তার মূল্য কত। এখানে চাকুরির বাজারে বা বিবাহের বাজারে তার কোন দাম নেই। বাতিল মাল। বুঝতে পেরেছে আমেরিকার কোন ডিগ্রী না থাকলে তাকে ভাল কাজ কেউ দেবেনা। বাংলাদেশের লেখাপড়ার এখানে দাম নেই। এই লেখাপড়া নিয়ে কাজ মিলবে, জীবন চলে যাবে হয়ত। তার স্বপ্নের সাথে এর কোন মিল থাকবেনা। বাহার ভাই, লতা ভাবী সকলেই বলে লেখাপড়া শুরু করার জন্য। আমানের সাথে অনেক রাত পর্যন্ত এ নিয়ে আলাপ হল। আমান ডেলিভারীর কাজ করেও তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। আশা আছে, এই কোর্সটা পাশ করলে শিক্ষকতার কাজ মিলবে। এমন আরও বেশ কিছু বাঙালী আছে যারা শিক্ষকতা করছে। আমান বলল, লাইন ধর। যেমন আমি একটা লাইনে আছি। বেশি জিনিষ নিয়ে টানাটানি করলে কোনটাই হয়না। যা ধরবি তা শেষ করবি। তোর এখন উচিত হবে লেখাপড়া করা। সুযোগ আছে। ব্যবহার কর। অফিসে কাজ পেলেও তুই দশ বার ডলারের বেশি আশা করতে পারিস না। তোর চাচী যদি সুপারিশ করে কোথায়ও তাহলে চাকরি মিলবে হয়ত। কারন এ দেশে সুপারিশের অনেক দাম আছে। এখন তুই ভেবে দেখ কোনটা তোর ভাল লাগে।

পরের দিন বাহারের কাছে গেল আনিস। বাহার ভাই, আমার তিন মাসের মেয়াদ শেষ। রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। আমি কি করতে চাই। এরি মধ্যে ছোটখাটো একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এক পাত্রী আমাকে অবজ্ঞা করে বাতিল করে দিয়েছে। লতা ভাবী এক পাত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশের লেখাপড়া শুনে সে কোন পাত্তাই দিলনা। আমার লেখাপড়া করতে মন চায়না। এখন কি করি বলুন তো?

এদেশে যারা বড় হয়েছে তারা তো তোমাকে বাতিল করবেই। তাদের সমপর্যায়ে আসতে হলে তোমাকে সেভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। তুমি কিচ্ছু করবেনা। সোজা কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। চার বছর কষ্ট কর। জীবনটার একটা ভিত তৈরি কর। ভিত শক্ত থাকলে মন শক্ত থাকে, মন শক্ত থাকলে জীবন সহজ হয়। তোমার কোন পিছুটান নেই। তবে তুমি কেন লেখাপড়া করবেনা? এখনও সময় আছে। এদেশে ডিগ্রী থাকলে চাকরি মিলবেই। এই কয় বছরের কষ্টের ফল ভোগ করবে সারাজীবন। সারাজীবন কষ্ট না করে এই চার বছর কষ্ট কর। মনে কর তুমি জেলে আছ এই চার বছর।

লতাকে খবরটা দিল ফোনে। বলল, ভাবী আমার একটা খবর আছে।

কি খবর?

আমার সিদ্বান্তের খবর। আমি সিদ্বান্ত নিয়েছি লেখাপড়া করব।

এই তো হল উপযুক্ত সিদ্বান্ত। তাহলে সুরির কথায় কাজ হয়েছে! একজনের ঘেন্না আর এক জনের জীবন বদলে দিতে পারে দেখছি! অবজ্ঞা, ঘেন্না সব সময় খারাপ কাজ নয়! জেদও খারাপ নয় অনেক ক্ষেত্রে! মানুষের জেদ এমনই হওয়া উচিত। দু'টা কাজে জেদ থাকা ভাল - একটা হল লেখাপড়ায় প্রতিযোগিতা করে ভাল করা, আর একটা হল জমিতে ফসল ফলানো।

বিকেলে চাচীর কাছে গেল আনিস। চাচা তখনও আসেনি। সুসান তাকে দেখে খুশিতে আত্মহারা। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, কি খাবে?

শুধু কফি।

তুমি কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

হ্যা, আমি লেখাপড়া করব স্থির করেছি।

এক্সিলেন্ট! ওয়াইজ ডিসিশন! আমিও ভাবছিলাম তোমাকে বলব লেখাপড়া কর। লেখাপড়া নিজের সম্পদ। তোমার মত যুবকদের দৃষ্টি থাকবে আকাশের দিকে। স্বপ্ন থাকবে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছার। শিখরে পৌঁছতে হলে চাই শক্তি। সে শক্তি হল লেখাপড়া। যতদিন ইচ্ছে লেখাপড়া কর। আমরা আছি তোমার পেছনে। সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আমি খুব খুশি হয়েছি, মাই সান! বস, রহমান এখনি এসে পড়বে। আজ ডিনার করে যাবে।

চাচা শুনে আরও খুশি হল।

সাবাস বেটা! এই তো পুরুষের মত কথা! তুমি লেখাপড়ায় ভাল করবে সে বিশ্বাস আমার আছে। যতদিন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পার ততদিন আমরা আছি। তোমার কোন চিন্তা করতে হবেনা।

সুসান জিজ্ঞেস করল, কোন্ বিষয় নিয়ে পড়বে ভাবছ?

কম্পিউটারের উপর পড়ব। শুনেছি সিটি কলেজে ভর্তি হওয়া সহজ। কালই যাব ভর্তির ব্যাপারে।নিয়ম জানার জন্য।

এমন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে যা তোমার কাছে মনে হয় ভাল করবে। যে বিষয়ে তোমার কোন আগ্রহ নেই সে বিষয় নিয়ে ভাল ফলাফল করতে পারবেনা। সুসান বলল।

কম্পিউটারের উপরই আমার আগ্রহ। বাংলাদেশে ছয় মাসে যা শিখেছি তাতে আমার আগ্রহ জেগেছে আরও জানার জন্য।

ভেরি গুড! এগিয়ে যাও। গড ইজ উইথ ইউ।

আনিস বলল, চাচী, আমি ভাবছি উইকএন্ডে কাজ করব আমার নিজের খরচ চালানোর জন্য।

চাচা চাচী দুজনেই হেসে উঠলেন। চাচী বললেন, কি বললে? তুমি কাজ করবে? কেন? আমরা মরে গেছি নাকি? ছাত্র অবস্থায় কাজ কারা করে? এক, যাদের টাকা পয়সা জোগাড় হয় না তারা। আর এক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। তুমি কাজ করলে করবে কোন একটা অড জব। তাতে তোমার এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে কোথায়ও দেখাতে পারবে না। কাজেই তোমার এ ধরনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত তোমার টাকা পয়সার অসুবিধা নেই। কারণ আমাদের কোন ছেলেপেলে নেই, কোন খরচও নেই। এক হাজার ডলারের বেশি আমরা ইচ্ছে করলেও খরচ করতে পারি না। আমাদের ঘর ভাড়া লাগে না। আমাদের এ টাকা সৎ কাজে লাগাতে চাই। আর এই সৎ কাজটা হল আমাদের ছেলের লেখা পড়া। তাতে যা লাগে, যত বছর লাগে আমরা দেব। তুমি লেখাপড়া শেষ না করা পর্যন্ত কাজের চিন্তা করবে না। কাজ করে লেখাপড়ায় সম্পুর্ণভাবে মন দেয়া যায় না।

আনিস চুপ করে রইল।

-২৫-

এ সপ্তাহে পার্টি হবে নিখিলের বাসায়। তার মেয়ের জন্মদিন। আমাদের দেশের বাচ্চাদের জন্মদিন হয় আমাদের ষ্টাইলে। মাতাপিতার বন্ধুবান্ধব আসে তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। যাদের ছেলে মেয়ে নেই তারাও আসে। বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসে। খেয়েদেয়ে আড্ডা দিয়ে চলে যায়। কিন্তু এদেশের বাচ্চাদের জন্মদিন হয় যার জন্মদিন তার বন্ধুদের নিয়ে। মানে একই বয়সের বাচ্চাদের নিয়ে। সেখানে মাতাপিতা দাওয়াত পায়না। বাচ্চারা নিজেদের মত হই হল্লা আনন্দ ফুর্তি করে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাচ্চার মাতাপিতারা বাচ্চাকে নামিয়ে দিয়ে যায়। আবার ঠিক সময়ে এসে বাচ্চা নিয়ে যায়। তাই নিখিলের মেয়ে তার ক্লাশের কয়েকজন বন্ধুকেও দাওয়াত করেছে। ওদের জন্য একটা রুম আলাদা করে দেয়া আছে আজকের জন্য।

নিখিল থাকে জ্যাকসন হাইটস-এ। বাঙালী, পাকিস্তানী, ইন্ডিয়ান আর শ্রীলঙ্কার মিলন কেন্দ্র। কেন্দ্রটি হল বাজার। এখানে এই চার দেশের প্রবাসীর বাজার। প্রতিটি দোকানপাটের মালিক এই চার দেশের মানুষ। এখানে পাওয়া যায়না এমন কোন জিনিষ নেই। বাজারের আশে পাশে সমস্ত এলাকায় এই চার দেশের মানুষের বাস। মাঝে মাঝে স্প্যানিশও আছে। আর আছে কিছু চাইনীজ। জ্যাকসন হাইটসের বাজারের পূর্ব দিক থেকেই শুরু হয়েছে স্প্যানিশের বসতি। ক্রাইমের জন্য বিখ্যাত। সরকার এই এলাকাটাকে ক্রাইম জোন হিসেবে চিহ্নিত করে ইমার্জেন্সি জারি করেছে। দিনে রাতে যত রকমের চুরি ডাকাতি ছিনতাই ইত্যাদির হোতা এই স্প্যানিশরা। বিশেষ করে ড্রাগ ব্যবসার জন্য এই এলাকাটা বিখ্যাত। ইটালীয়ানদের পরই ড্রাগ ব্যবসায় স্প্যানিশ। অথচ নাম কাউলাদের।

বাজারের বামদিকেই অনেক হাই রেইজ এপার্টমেন্ট বিল্ডিং। ঠিকানা মিলিয়ে আনিস যখন পৌঁছল তখন বাসায় মানুষ গিজ গিজ করছে। যেন একটা ছোটখাটো বাজার বসেছে। মনে হয় কারও খবর কেউ রাখছেনা। বসার যতগুলো আসন আছে সবগুলোই যার যার দখলে। দরজায় দাঁড়িয়ে আনিস ভাবছে কোন দিকে দাঁড়াবে। এমন সময় নিখিল এসে বলল, এসে গেছ? এদিকে আস। এই বারান্দায় এখনও দুটো চেয়ার খালি আছে। আপতত ওখানে বস। বাহারও আছে ওখানে।

এখানে আরও কয়েকজন বসে জমিয়ে গল্প করছে। আনিসকে দেখেই বাহার বলল, এইদিকে বস। বলে তার পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। তারপর আবার গল্পে মন দিল। যিনি গল্প বলছেন তার বয়স তিরিশ বত্রিশ হবে। সাদামাটা চেহারা। বেঁটেখাটো। গল্পের রেশ ধরে তিনি বাহারকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি করি বলুন তো?

এখন আর কি করবেন। কাগজ ছাড়াই কাজ দেখুন। আর লুলাক নামক একটা প্রোগ্রাম আছে। তার জন্য একটা দরখাস্ত দিয়ে রাখুন। যদি কোনদিন কিছু হয়। তাছাড়া আর একটা রাস্তা আছে বিয়ে করে বৈধ হওয়া। আপাতত আর কোন পথ নেই।

কাগজ ছাড়া কাজ ও তো কেউ দেয়না।

বাঙালী কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করুন। সিক্সথ ষ্ট্রিটে অনেকগুলো বাঙালী রেষ্টুরেন্ট আছে। সেগুলোতে খোজ করুন। অনেকগুলো কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী আছে সেগুলোতে দেখুন। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। অত চিন্তার বা ভয়ের কিছু নেই। এমন তো আরও কত মানুষ এসেছে। কেউ তো ফিরে যাচ্ছেনা। তারপর আনিসের দিকে ফিরে বলল, এ হল মনিরুল হক। ওপি ওয়ান ভিসায় ১৮ নম্বরে এসেছে।

আনিস বলল, ওপি ওয়ান বুঝলাম, কিন্তু ১৮ নম্বর কথাটা বুঝলাম না।

১৮ নাম্বার বুঝলেনা? ওপি ওয়ানে একই বিজয়ী লটারী নাম্বারে অনেক লোক এসেছে। ওই নাম্বারে মনির সাহেব হল ১৮ নম্বর।

এতগুলো লোক একই নাম্বারে কিভাবে এল?

এদের একটা সংঘবদ্ধ চক্র আছে। দেশে এবং এখানে। কিছু আমেরিকান এম্বেসির কর্মচারী। এদের ব্যবসা এটা। কোন কোন লটারী বিক্রি করে দেয়। আসল যে মানুষ লটারী পেল সে খবরই জানেনা। একের পর এক বিক্রি হতে থাকে। আবার কেউ কেউ পেয়েও আসতে পারেনা। মাঝপথেই হাতবদল হয়ে যায়। অনেক কেলেঙ্কারি এসব ওপি ওয়ান নিয়ে। এই ওপি ওয়ানের জন্য কত মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছে!

আনিস জিজ্ঞেস করল, এসব কেলেঙ্কারি কিভাবে বন্ধ করা যায়?

বন্ধ করবে কেন? যত রকম দুনম্বরিই হোক তবুতো মানুষ আসতে পারছে? বাংলাদেশ থেকে মানুষ বাইরে আসা প্রয়োজন, যেভাবেই হোক। এক নম্বর হোক, বা ১৮ নম্বর হোক। জালিয়াতির দিক দিয়ে মনে করোনা বাংলাদেশ প্রধান। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জালিয়াতি কিছুই না। এই ধর শ্রীলঙ্কা, চায়না, ফিলিপাইন, মেক্সিকো, স্পেন, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া এসব দেশের জালিয়াতি যদি শোন তাহলে বলবে বাংলাদেশ অনেক ভাল। এদেশে আসার জন্য কোন দেশটার মানুষ জালিয়াতি করেনা? চাইনীজরা তো জাহাজ ভর্তি করে এনে ছেড়ে দেয় সমুদ্রের তীরে। এ বছরওতো একটা আটক করেছে। দু'হাজার মানুষ। ওদেরকে প্রথমত গ্রেফতার করেছে, পরে কিসব মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আমরা তো দুটা একটা লোক আনার চেষ্টা করি, আর

ওসব দেশ তো জাহাজ ভর্তি নিয়ে আসে। তাদের কোন কাগজপত্র নেই। অথচ এক সময় দেখা যায় সব বৈধ হয়ে গেছে। এদেশে সবচেয়ে কম লোক বাংলাদেশের। আমাদের উচিত আরও রাস্তা বের করা কিভাবে আরও বেশি মানুষ আসতে পারে। তবে আমাদের দেশে এইযে ওপি ওয়ান নিয়ে জালিয়াতি হচ্ছে তা বন্ধ করা প্রয়োজন। কারন যার প্রাপ্য সে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, চুরি করে আর একজন চলে আসছে। এটা নিজেদের মানুষকে নিজেরা পথে বসাচ্ছে। এটা বন্ধ করা উচিত।

এরি মাঝে নিখিল এসে বলে গেল খাবার শুরু হয়েছে। প্লেটে নিয়ে এসে খাও আর গল্প কর। তারা সকলেই উঠে গেল। গিয়ে দেখে লাইন। বাচ্চারা আগে, তারপর মহিলা, সব শেষে পুরুষ। বাহার বলল, লাইন শেষ হোক, তারপর আসা যাবে। চল, ফিরে গিয়ে বসি। তাদের দেখাদেখি লাইনছুট হয়ে চলে এল নির্মল। এসে তাদের গল্পে যোগ দিল। বাহার পরিচয় করিয়ে দিল। এই হল আমাদের তৌফিক। একটা কম্পিউটার স্কুল চালায়। নিজে আগে কষ্ট করেছে। অড জব করে লেখাপড়া করেছে চার বছর। তারপর চাকরি শুরু করেছে সত্তর হাজার ডলার দিয়ে। তাতে তার মন ভরেনি। শেষ পর্যন্ত নিজেই স্কুল দিয়েছে। কম্পিউটার শিখায়। এখন তার মাসিক আয় কম করে হলেও তিরিশ হাজার নেট। বার দিয়ে গুন করে বাংলা টাকায় রূপান্তর করে দেখ কত কামায় বছরে। এ তার কর্মের ফল। কর্ম করেছে, ফল ভোগ করছে। গত তিন বছরে সে মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তির মালিক হয়েছে। মার্সিডিস চালায়। তিনটা বাড়ীর মালিক। যে বাড়ীতে থাকে তা রাজপ্রাসাদকেও হার মানায়। দাম এক মিলিয়ন। এখন নিজে কাজ না করলেও তার পয়সা আসতে থাকবে।

লাইন কমে যাওয়ায় তারা চলে গেল খাবার টেবিলে। যার যার প্লেট নিয়ে আবার এসে বসল নিজেদের জায়গায়। খাওয়া চলছে, গল্পও চলছে। এমন সময় দু বাচ্চাসহ এক পরিবার এসে ঢুকল। নিখিল এগিয়ে গেল। তোমাদের এত দেরী হল কেন মজিদ?

ওর কাজ শেষ না হলে আসব কেমন করে? জান তো ও সাতদিন কাজ করে। পাঁচটার আগে ছুটি নেই। এসময় আনিস হাত ধুয়ে বারান্দায় যাচ্ছিল। নিখিল ডাক দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল। আমার ছোট বেলার বন্ধু মজিদ। এদেশে এসেছে তিন বছর। এখন হাউস হাসবেন্ড। বুঝলে কথাটা? আমাদের দেশে হাউস ওয়াইফ আছে, হাউস হাসবেন্ড নেই। এখানে হাউস হাসবেন্ড আছে। এই মজিদ ছিল তুখোড় ছাত্র, কড়া স্বামী এবং একজন জাঁদরেল ইঞ্জিনিয়ার। ওয়াপদায় চাকরি করত। দেশে চাকর বাকরের অভাব ছিলনা। এখানে এসে কাজের অবস্থা দেখে ফিরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাবী দেয়নি। বলেছে প্রয়োজনে সে নিজেই কাজ করে সংসার চালাবে। তবু দেশে ফেরত যাবেনা। রান্নঘরের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেছে আর কি! এর মধ্যে পলিটিক্যাল মেরে কেইস পেয়ে গেছে। আর ফিরে যাওয়া হবেনা। এদেশে মেয়েদের কাজ সহজে মেলে, অড জবে মেয়েদের বেতন ভাল। মজিদ কাজ পায়না। এ দেশের কোন ডিগ্রী না থাকলে কাজ মেলেনা। মজিদ কিছুতেই লেখাপড়া আর করবেনা। অন্তত: একজনকে কাজ করতে হবে। আর একজনকে বাচ্চা লালন করতে হবে। তাই ভাবী কাজ করে, আর মজিদ বাচ্চা রাখে। এ রকম অনেক ফ্যামিলি আছে। শুধু বাঙালী নয়, সব দেশের। এমন কি খোদ আমেরিকানও আছে হাউস হাসবেন্ড। এ কাজ পেয়ে হাউস হাসবেন্ডরাও মহাখুশি। আমাদের মজিদও। তবে

মজিদের ক্ষমতার এত অবনতি হয়েছে যে এত বছর বউকে খাটিয়ে মেরেছে, এবার বউ তার প্রতিশোধ নিচ্ছে যেন। তুমি বোধ হয় এই চাকরিটার ডিউটি ঠিক ধরতে পারনি। খুব মজার। মজিদের কাজ হল বাচ্চাদের ঠিক সময়ে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা, গোসল করানো, খাওয়ানো, ঘরের হাড়িপাতিল পরিষ্কার করা, রান্না করা, ভাবী কাজ থেকে ফিরলে তার তদারকি করা। মোট কথা ভাবী বাংলাদেশে যে কাজগুলো করত ঠিক সেই কাজগুলো মজিদকে করতে হয়। তবে বাংলাদেশে ভাবীর কিছু সাহায্যকারি ছিল এখানে তা নেই।

ক্ষমতার হাত বদল হয়। কখন কোন্ ক্ষমতা কিভাবে কেন বদল হয় তা কেউ জানে না।

-২৬-

দুপুরে মেসে কেউ থাকে না। লতা মাঝে মাঝে আসে। কোন দিন রান্না শেষ করে দিয়ে যায়, কোনদিন শুধু গল্প করেই কাটিয়ে দেয়। আবার কোন দিন দোকানে দোকানে ঘুরে টুকটাক জিনিষ কেনে। স্কুল ছুটির সময় হলেই চলে যায়। আনিসও সাথে যায়। কোনদিন লতার ঘরে বসে টিভি দেখে, চা খায়। কোনদিন শান্তকে নিয়েই চলে যায় আনিসের বাসায়। শান্ত এখন প্লে গ্রুপে। কোন হোম ওয়ার্ক থাকেনা। আনিসের সাথে শান্তর খুব ভাব হয়ে গেছে। আনিস শান্তকে যখন তখন এটা সেটা কিনে দেয়।

একদিন আনিসের ঘরে ঢুকেই দেখে টেবিলে একটা বই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম'। দেখেই লতা ছুটে গিয়ে বইটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, এ বই কোথায় পেলেন?

যেন বুভুক্ষ মানুষ হঠাৎ খাদ্য পেয়েছে হাতে! গোগ্রাসে গিলবে। পাতা উল্টাতে উল্টাতে আবার বলল, বইটার কথা শুনেছি। যোগাড় করতে পারিনি। কোথায় পেলেন?

আনিস লতার চোখ মুখের অবস্থা দেখে মিটি মিটি হাসছে। বলল, আছে। একটা জায়গা পেয়েছি সেখানে অনেক বই আছে। আনা যাবে, পড়ে আবার ফেরত দিতে হবে।

কোথায় সে জায়গা?

বাহার ভাই'র বাসা।

আমি যাব। নিয়ে যাবেন?

আর এক জনের বাসায় আমি কি হিসেবে কিভাবে নিয়ে যাব?

অসুবিধাটা কি? আমি কি মানুষ নই? আমি নিজেই যাব। দিন, ঠিকানাটা দিন বা ফোন নাম্বারটা।

বরং বই আনি, পড়ে ফেরত দিয়ে দিলেই হবে। বই পড়ার যদি এতই সখ তাহলে কিনে নিলেই পারেন। টাকার তো অভাব নেই।

কোথায় পাব এসব বই?

কেন, এখানে তো দুটা বইর দোকান আছে। একটা সহীদের 'বইঘর' আর একটা বিশ্বজিতের মুক্তধারা।

ওখানে সব বই পাওয়া যায়?

ভাল লেখকের প্রায় সব বইই পাওয়া যায়।

আমি তো এসব কিছুই জানি না! এমন একটা পরিবেশে আছি যেখানে এসবের কোন আলোচনাই শুনি না। শুধু ধর্মের আলোচনা। শুধু ব্যবসার কথা। টাকার মোহ তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। এ পর্যন্ত কোন একজন সংস্কৃতিমনা মানুষের সাথেও পরিচয় হয়নি। এমন একটা

লোকের সাথে ঘর করি যে মানুষ এসব কিছুই জানে না। জানতেও চায় না। বাংলা পত্রিকাও সে পড়ে না। আর কিছু তার চাই না। শুধু টাকা। মনে হয় আমি একটা মুর্খ লোকের সাথে কোন এক গ্রামে ঘর করছি। আমার স্বাদ আহ্লাদ নেই, শুধু রুটিন মাফিক ছেলেকে স্কুলে আনা আর নেয়া। এই আমার জগত। এর বাইরে আমি কিছুই জানি না। জানতে পারি না। যে সব মহিলাদের সাথে পরিচয় তারাও এসবের কোন খবর রাখেনা। আমি তো এমন একটা আমেরিকান জীবন কল্পনা করিনি। কল্পনা ছিল হাসি আনন্দে উচ্ছল একটা জীবন। এখন আমার জীবনের গন্ডী বাচ্চার স্কুল আর ঘর।

হঠাৎ করেই লতা যেন উত্তেজিত হয়ে গেল। তার চোখে মুখে একটা ক্ষোভের ছায়া ফেলে গেল। একটু থেমে আবার বলতে লাগল -সৈয়দ সাহেব ঘরে ফিরেই ব্যস্ত হয়ে যায়। তার সাথে দুটা কথা বলারও সুযোগ নেই। যেন একটা মেশিন। টেলিফোন নিয়ে বসে যায়। কত ফোন। মাঝে মাঝে দুএকটা কথা কানে আসে। 'সৌদি আরবের টাকা তো পৌছে যাবার কথা! ... না, না, সেখানে টাকা যাবেনা ... হ্যা, হ্যা, হুজুরের হাতে দিতে হবে .... নতুন মাদ্রাসার জন্য এটা .. ইত্যাদি অনেক রকমের আলাপ। এসব চলে রাত এগারটা বারটা পর্যন্ত। তারপর টিভির সামনে আসে। যতক্ষন পারে দেখে। এক সময় ঘুমাতে যায়। সকালে উঠেই চলে যায় অফিসে। এত ব্যস্ত থাকে যে বাসায় একটা ফোন করারও সময় পায় না। আমাকে বলে প্রয়োজন হলে তাকে কল দিতে। সেই মানুষের কাছে এসব খবর পাব আশা করি না। আমি তো কিছুই জানি না এসব দোকান সম্মন্ধে। আপনি আমাকে বইর দোকানে নিয়ে যাবেন। কোথায় সে দোকানগুলো?

জ্যাকশন হাইটসে।

কবে নিয়ে যাবেন?

লতা জ্যাকশন হাইটস সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানে না। বছর দুয়েক আগে একদিন গিয়েছিল সৈয়দের সাথে কি কাজে মনে নেই। বাংলাদেশি খাবার চার্চ এভিনিউতেই পাওয়া যায়। তাই জ্যাকশন হাইটসে যাবার প্রয়োজন পড়ে না।

আনিস বলল, নিয়ে যেতে হবে কেন? এটা আমেরিকা! মেয়েরা অসহায় নয়। বীরদর্পে আপনি নিজেই যেতে পারেন।

একা কোথায়ও যেতে পারি না। নিজকে মনে হয় খুব অসহায়, এতীম। তাই কোথায়ও যাওয়া হয় না। সৈয়দ সাহেব তো কোন দিনই সময় দিতে পারে না।

ঠিক আছে। বাহার ভাইর ওখানে শতখানেক আছে। এগুলো শেষ হলে তখন যাওয়া যাবে জ্যাকশন হাইটসে।

তাহলে বাহার ভাইর বাসায় চলুন।

এখনই? যেটা হাতে আছে তা শেষ করুন, তারপর নিয়ে যাওয়া যাবে।

আপনি তো বলেন বাহার ভাইর বাসা কাছেই। তাহলে এখনই চলুন। দেখে আসি।

অগত্যা আনিসকে রাজি হতেই হল। দশ বারটা ব্লক। পায়ে হেটেই রওয়ানা দিল।

পথে যেতে যেতে লতা বলল, আমি কালই যাব জ্যাকশন হাইটসে। কেউ আমার সাথে যাক বা না যাক। আমি বই কিনব। ঘর ভরে ফেলব আমার পছন্দের বই দিয়ে।

যাক, তাহলে এখানে একটা বাংলা পাবলিক লাইব্রেরীর আশা করা যায়।

টিটকারী মারবেন না! দেখবেন আমার পছন্দের বই যা পাই সব কিনব। আচ্ছা, তুমি তো আমার দেবর। দেবরকে আবার আপনি আপনি বলতে হয় কেন?

আপনি বলেন কেন?

তুমি ত মানা করনি। নিজে থেকে বলনি বলে আমি নিজেই শুরু করলাম তুমি বলা।

এটাই তো উচিত ছিল শুরু থেকে। আজ থেকে তুমি বলেই ডাকবেন।

বাহারের বাসায় বেল টিপছে। কোন সাড়া নেই। বিন্দু ভাবী বোধ হয় বাসায় নেই। কিন্তু সে তো একা কোথায়ও খুব একটা যায় না। আনিসরা যখন ফিরে আসবে ভাবছে তখনই ভেতর থেকে আওয়াজ শোনা গেল। কে?

বিন্দু বাচ্চাদের স্কুলে পাঠিয়ে একটা দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। এখন বাজে দশটা। এই অসময়ে কে এল ভেবে জিজ্ঞেস করল। ওপাশ থেকে উত্তর এল, এই গরীব বান্দা আনিস।

দরজা খোলে আনিসের পাশে লতাকে দেখে বিন্দু একবারে থ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারল না। লতার চোখাচোখি হতেই বলল, আস, ভেতরে আস।

আনিস বলল, এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। আমার দোষ নেই। আমি এখনই আসতে চাইনি। এই নাছোর বান্দা লতা ভাবীর তর সইছে না। বই দেখতে এসেছে। একজন সিরিয়াস পাঠক। বাহার ভাইর বইর সংগ্রহের কথা শুনে একবারে অতিষ্ট হয়ে গেছে। এখনই তার দেখা চাই।

বিন্দু কোন কথার উত্তরই দিতে পারছে না। বিন্দু কোন দিন কোন মহিলাকে সুন্দরী বলেনি। তার চেয়ে কেউ সুন্দরী আছে তা সে স্বীকার করে না। যদি কেউ এমন আভাস দেয় তা হলে তার খবর আছে। তার চেয়ে সুন্দরী মহিলাকে নানা দোষে দোষি করে, অনেক খুত বের করে তার জেতা চাই। কোন মতেই কোন মহিলাকে সে সামান্য সুন্দরী বলতেও রাজি নয়। আজকে লতাকে দেখে সে সব চিন্তা মাথায় আসেনি। মনে মনে বলল, এ যে একটা পুতুল! বিধাতার অনবদ্য সৃষ্টি! মাথায় ঘন লম্বা চুলের এতবড় খোপায় তার দৃষ্টি থেমে আছে। সে লতার দিকে তাকিয়ে আছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েক বার চোখ বুলিয়ে বলল, না, আমি বিরক্ত হইনি। ভালই হল মেহমান নিয়ে এসেছ। আস, চা করি।

লতা বলল, না আপা আজকে আমি মেহমান নই। আজকে এসেছি শুধু বই দেখে চলে যাব। আপনি যদি অনুমতি দিন তাহলে মাঝে মাঝে এসে আপনাকে বিরক্ত করব। আমি বইর পাগল।

বিন্দু সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। এখানকার যা অবস্থা! কে কার সাথে কখন চলে যায় কেউ জানে না। এসব ঘটনা নিজেদের পরিচিতজনের মধ্যেই ঘটছে। তাই যেখানে কোন সুন্দরী দেখে সে বাসায় দ্বিতীয়বার আর পা ফেলে না বা যোগাযোগ রাখে না। লতাকে দেখে তার মনে হল এ সুন্দরী এসেছে আনিসের সাথে। বিন্দুর ঘরের দিকে নজর দেবেনা নিশ্চয়ই। বলল, অবশ্যই আসবেন। বই তো পড়ার জন্য। যখন ইচ্ছে তখন আসতে পারেন।

আমাকে কি আপনার ছোট বোনের মত মনে হয় না? তাহলে আপনি আপনি করছেন কেন? তুমি বললেই আমি খুশি হব। আমার নাম লতা। নাম ধরে ডাকবেন। আমি আপনার ছোট বোনের মত।

ঠিক আছে, তাই হবে। আস, ভেতরে আস। আনিস তুমি বই দেখাও, আমি চা করে নিয়ে আসি।

না ভাবি, চা খাবনা আজ। আর একদিন খাব।

না, চা না খেয়ে যেতে পারবে না।

লিভিং রুমের এক কোনে একটা বইর শেলফ। লতা বই দেখে যেন আনন্দে নাচতে লাগল। এটা ধরে, ওটা রাখে। মনে হচ্ছে সব বই এখই শেষ করে ফেলবে। একটা একটা করে বই টেবিলে রাখছে। মনে হয় সব নিয়ে যাবে।

আনিস বলল, এক সাথে কয়টা বই পড়তে পারবেন? এতগুলো এক সাথে না নিয়ে একটা দুটা করে নিলেই বোধ হয় ভাল।

ইচ্ছে তো হয় সবই নিয়ে যাই। আমার পড়ার সময় আছে। দেখবে এক মাসের মধ্যেই এই সব বই পড়ে ফেলব।

খুব ভাল ছাত্রী ছিলেন মনে হয়। বাংলায় কত নম্বর পেয়েছিলেন?

এসময় বিন্দু চা নিয়ে এসেই জিজ্ঞেস করল, কার বাংলা সাবজেক্ট ছিল?

বাংলা সাবজেক্ট নয়, লতা ভাবীর বইপ্রীতি দেখে জিজ্ঞেস করছি বাংলায় কত পেয়েছিল।

তুমি মানুষকে ঝামেলায় ফেল শুধু শুধু। বইপ্রীতির সাথে বাংলায় কত পেয়েছিল'র সম্পর্ক কি? তুমি কি এখন নম্বর বাড়িয়ে দিবে? তুমি বাংলায় কত পেয়েছিলে? আমি বাংলার ছাত্রী। আমি তোমার নাম্বার ঠিক করে দিতে পারি যদি কম পেয়ে থাক।

না, আর কথা বলা যাবে না। দল ভারী হয়ে গেছে। আমি এখন যাই।

চা খেয়ে যাও। যাকে নিয়ে এসেছ তাকেও নিয়ে যাও সাথে।

না, আমি একাই যেতে পারব, লতা বলল। বাসা তো কাছেই, অসুবিধা হবেনা। এই প্রথম একটা পরিবারের সাথে আমার পরিচয় হল যেখানে বই সংগ্রহ করা আছে। তাও আবার বাংলা বই।

এসব বই যা দেখছ তা বেশিরভাগ আমার কেনা। দেশ থেকেও কিছু আনিয়েছি।

ও, এজন্যই গলার আওয়াজটা বেশ শক্ত, আনিস বলল।

গলার আওয়াজ মোলায়েম করলে তো তোমরা মাথায় উঠতে চাও, তাই শক্ত রাখি।

কে বেশি পড়ুয়া, বাহার ভাই নাকি আপনি?

এক সময় আমি তো বইর পোকা ছিলাম। এখনও সময় পেলেই বই নিয়ে বসি।

এখানে যেসব বই আছে সব আপনার পড়া হয়ে গেছে?

সব পড়া হয়ে গেছে।

এইযে দেবেশ রায়ের তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত এটাও কি পড়েছেন?

হ্যা, অনেক আগেই পড়েছি।

তাহলে তো বুঝতে হবে আপনি ধৈর্যশীল পাঠক। আপনাকে বাংলায় একশ'তে একশ দিলাম।

তুমি আমাকে নাম্বার দেবার কে? বরং আমিই তোমাকে দেব।

ভুলে যাবেন না ভাবী, আমার লিটারেচার ছিল প্রধান বিষয়।

আর আমার ছিল বাংলা প্রধান বিষয়।

লতা এতক্ষন চুপচাপ শুনছিল তাদের তর্ক। বলল, ভাবী, আপনাদের এই ঝগড়া আমার এত ভাল লাগছে যে সব সময় যদি কেউ আমার সাথে এসব নিয়ে তর্ক করত তাহলে আমার সময় কাজে লাগত। আমার মনে হয় আপনি আমার চেয়ে বেশি পড়ুয়া। আপনার বইগুলো তা প্রমান করে। আমি কিন্তু যখন তখন আপনাকে বিরক্ত করব। এখানে আমার এমন কোন বান্ধবী নেই যার সাথে কথা বলে সময় কাটানো যায়।

তোমার জন্য সব সময় দ্বার খোলা। যখন ইচ্ছে তখন আসবে।

চা শেষে শুধু বুদ্বদেব গুহের মাধুকরী নিয়েই আজকের মত বিদায় নিল লতা।

পথে এসে বলল, ট্রেড ফেয়ার হয়ে যাব। সামান্য কিছু কিনতে হবে। তুমি সাথে থাকলে হেল্প হবে। হাটতে হাটতে সুপার মার্কেটে এসে পৌছল। ঢুকতেই চোখাচোখি হয়ে গেল রিনার সাথে। আজকে তার কাজ সকালের শিফটে। রিনা দুজনকে দেখে একটু হাসল। বাজার করে বেরিয়ে আসার সময় কাউন্টারে যখন দাম দিতে গেল তখন রিনা খুব হাসিমুখে দুজনের সাথে কথা বলল। লতাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার দেবর বুঝি? একটু মুচকি হাসল।

মার্কেট থেকে বেরিয়ে রিনা ভাবতে লাগল আজকে রিনার কথাবার্তা যেন অন্য রকম। লতার সাথে অনেক দিনের পরিচয়। আজ চার বছর রিনা এখানে কাজ করে। প্রায় দুবছর থেকেই লতার সাথে পরিচয়। মেয়েরা মেয়েদের ভাল বুঝতে পারে। তাদের একটা আলাদা ইন্দ্রিয় থাকে যা দিয়ে একজন আর একজনকে পরিক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ নির্নয় করতে পারে। এমন কি রোগ হবার আগেই লক্ষন দেখে ভবিষ্যতবাণীও করতে সক্ষম। কোন সময় শুধু এক নজর দেখেই রোগ ধরতে পারে, কোন সময় একটু কথাবার্তা বলে। আজকে রিনা কথা বলছিল লতার সাথে, কিন্তু চোখ ছিল আনিসের দিকে। তাও আবার সরাসরি নয়।

মার্কেট থেকে বেরিয়ে ওরা লতার বাসার দিকে হাটতে লাগল। আনিসের হাতে দুটো পলিথিনের ব্যাগ। লতার হাতে বই। লতার মনে খচ খচ করছে। রিনার চাহনি কথাবার্তার খচখচানি। মনে মনে রাগ হচ্ছে রিনার উপর। সে কি ভেবেছে! তার মত মনে করেছে নাকি!

লতার মৌনতা লক্ষ করে আনিস জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছেন ভাবী?

ভাবছিলাম রিনার কথা।

রিনা ভাবীর কথা ভাববার কি আছে?

ভাইএর স্ত্রী হলে তো ভাবী হয়, রিনা তোমার ভাবী হল কি করে? ও তো এক পাকিস্তানির স্ত্রী।

উনি বাঙালি না?

হ্যা, রিনা বাঙালি। কিন্তু বিয়ে করেছে এক পাকিস্তানিকে। এই সুপার মার্কেটেই কাজ করে।

এখানে পরিচয়ের পরই বুঝি বিয়ে হয়েছে?

হ্যা, এখানে কাজ করতে করতেই এই কান্ড হয়েছে।

কি কান্ড?

সে এক কাহিনী।

আপত্তি না থাকলে শুনতে পারি কি?

এই বিদেশে বাঙালি মেয়েদের পাকিস্তানপ্রীতি বেড়ে গেছে। যেখানেই অড জব করতে যাও সেখানেই পাকিস্তানি আছে। তারা আমাদের আগে থেকেই বিদেশে আছে এবং কাজেও তারা আমাদের সিনিওর। সেই সুবাদে তারা কেউ মেনেজার, কেউ সুপারভাইজার। কাজের সূত্রে প্রতিদিন মেলামেশা করতে হয়। আর এই মেলামেশা করতে করতেই

অবাধ মেলামেশা হয়ে যায়। কাজের বাইরেও তারা সময় কাটায়। যাকে বলে পীরিত হয়ে যায়। রিনাকে তার স্বামী প্রথমে বাইরে কাজ করতেই দিতে চায়নি।

রিনার স্বামী ছিল? আনিস মাঝখানে প্রশ্ন করে বসল।

হ্যা, স্বামী ছিল, একটা ফুটফুটে সাত বছরের মেয়েও আছে। সেই সংসারটা ভেঙে এখন মেয়েটা নিয়ে পাকিস্তানির সাথে ঘর করছে। দেখা যাক কতদিন টিকে!

আগের স্বামী কোথায়?

আছে এই শহরেই। আধা পাগল। কিছুদিন পথে পথে ঘুরেছে। তারপর এক মেসে গিয়ে উঠেছে। সরল সোজা মানুষ। প্রথমে বুঝতেই পারেনি। প্রায়ই কাজ থেকে দেরী করে ফিরত রিনা। তার স্বামী আলতাফ কাজ করত একটা গ্রোসারী ষ্টোরে। সকাল পাঁচটা থেকে একটা পর্যন্ত। যে বেতন পেত তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলত বা কিছু টান পড়ত। রিনাই একদিন বলল, এত টানাটানি করে কতদিন চলবে। তার চেয়ে আমি কাজ করি না কেন। আমার মত মেয়েরা তো কাজ করছে এবং বেশ রোজগার করছে। আলতাফ প্রথমত রাজি হয়নি। কিন্তু সংসারের টানাটানি মাঝে মাঝে তাকেও বিচলিত করে দেয়। হিসেব করে দেখল দুজনে কাজ করলে বেশ ভালভাবে চলা যাবে। তারপর এই সুপারমার্কেটে কাজ পেয়ে যায় রিনা। ম্যানেজার পাকিস্তানী আসলাম। রিনাকে দেখেই সে হায়ার করে এবং পরের দিন থেকেই কাজে লেগে যায়।

আসলাম রিনাকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিতে থাকে। তার ইচ্ছেমত কাজের সময় দেয়, হালকা কাজ দেয়, অনেক সময় আসলামের সাথে সাথেই রাখে তাকে সাহায্য করার জন্য। এমনি করে মাস ছয়েকের মাঝেই তাদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। সুপার মার্কেটে পেছনের দিকে ম্যানেজারদের একটা অফিসের মত থাকে। সেখানে তারা তাদের হিসাব দেখে। অনেক সময় সেই অফিসে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। হিসাব মিলায়।

আলতাফ ঘরে ফিরে আসলে রিনা কাজে চলে যায়। রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করে। ধীরে ধীরে দেখা গেল রিনা সময় মত ঘরে ফিরে না। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়, ওভারটাইম ছিল। কাজের ভীষণ চাপ। বড় ক্লান্ত থাকে। রাতে বিছানায় এলিয়ে পড়ে। আলতাফের সাথে কথা বলারও ইচ্ছে থাকেনা। বেচারা আলতাফও ভেবেছে রিনার জন্য কাজটা শক্ত হয়ে গেছে। বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন। তাই সে নিজেই প্রায় সবকিছু করে নেয়। মাঝে মাঝে ভাবে সে নিজে যদি আরও একটা কাজ জোগাড় করতে পারে তাহলে রিনার কাজটা ছাড়িয়ে দেবে। মনে মনে সে আর একটা কাজের সন্ধানে আছে।

একদিন আলতাফ ছুটি নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। সে কথা রিনাকে বলতে ভুলে যায়। ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে আলতাফ মনে করল রিনা বোধ হয় ঘুমায়। কলিং বেল আর বাজায়নি। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই সে স্বপ্ন দেখে। দেখে রিনা আর আসলাম উলঙ্গ। তার বেড রুমে। মেয়ে স্কুলে। তখন বেলা এগারটা। আলতাফের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে একবার চিন্তা কর! পুরুষ মানুষ যদি তার স্ত্রীকে পরপুরুষের বাহুলগ্ন দেখে তাহলে তার অবস্থা কি দাড়াবে! আলতাফ বিশেষ কিছুই করেনি। সোজা রান্নাঘরে গিয়ে একটা ছুরি নিয়ে এল। যেই ছুরি নিয়ে এল তখন দেখে ওরা দুজন আলতাফকে আক্রমন করতে এগিয়ে আসছে। রিনা বলছে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি

পুলিশ ডাকব! বেরিয়ে যাও ঘর থেকে! এখনি, এই মুহূর্তে! আমিই আসলামকে ঘরে এনেছি। আসলাম এখন থেকে এই ঘরে আমার সাথে থাকবে! তুমি বেরিয়ে যাও!

আলতাফ কিছুই বুঝতে পারছেনা! কে কথা বলছে? রিনা? সে কি স্বপ্ন দেখছে! সে কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে! সে কোথায়, কার সাথে! না, সে ঘুমিয়ে নেই! আসলাম রিনার পেছনে দাঁড়িয়ে কাপড় পড়ছে। আলতাফ রিনাকে ধাক্কা দিয়ে আসলামের বুকে ছুরি বসাতে গেল। আসলাম আলতাফের চেয়ে অনেক বলিষ্ট, লম্বায় চার ইঞ্চি বেশি। আসলামের হাতের ধাক্কায় ছুরি পড়ে গেল হাত থেকে। যখন ছুরি তুলতে গেল এ ফাঁকে আসলাম চট করে বেরিয়ে গেল। আলতাফ কাপছে। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছেনা। শুধু রিনার দিকে তাকিয়ে আছে। কি করবে! রিনাকে খুন করবে!

তার চাহনি দেখে রিনা ভয় পায়নি। মনে মনে বলছে, ধরা যখন পড়েই গেছি তাহলে সব কিছুর সমাধা হয়ে যাক। খুব জোর গলায় বলল, এটা আমেরিকা! বেশি বাড়াবাড়ি করলে ভাল হবেনা। এটা আমার স্বাধীনতা! আমি যার সাথে ইচ্ছা ঘুমাতে পারি। কারও কিছু বলার নেই। তোমার পছন্দ না হলে তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। আমার ব্যাপার আমি বুঝব। তোমার ইচ্ছে হলে তালাক নিয়ে নাও!

আলতাফ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এই কথাগুলো কি তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে! তার ভালবাসার ধন! দশ বছরের দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী! সুখ দুখের সাথী! চার বছরের প্রেমের ফসল পরিণয়! সমস্ত আত্মীয়স্বজনের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে, আর সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে যাকে জীবনসাথী করেছিলাম এই কি সেই! এই কি সেই রিনা যে আমাকে ছাড়া জীবনে আর কিছু চায়না! আমার বাম বাহুর উপর মাথা না রাখতে পারলে যার ঘুম আসেনা! আমার জীবন মরণের সঙ্গী! একটা সুখী সুন্দর জীবনের জন্য আমরা পাড়ি দিয়েছিলাম এই প্রবাসে। এত ভাল চাকরিটা ছেড়ে শুধু রিনাকে সুখে রাখার জন্যই এই বিদেশ! তার প্ররোচনাতেই বিদেশে এসেছিলাম শুধু সুখের জন্য! এত স্বপ্ন নয়! রিনা আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। যেন কিছুই হয়নি। এ যেন স্বাভাবিক ঘটনা, এই হয় বা হয়ে থাকে। তার এত সাহস কোথায় ছিল? পরিস্থিতি মানুষকে সাহসী করে তোলে। কোনদিন তো সে আমার কথার বরখেলাপ করেনি, প্রয়োজনের বেশি কিছু চায়নি কোনদিন। তার এমন কোন দাবীও তো ছিলনা যা পূরন করতে পারিনি! আজ কি হল! কেন হল! তার একমাত্র ইচ্ছা ছিল বিদেশে আসা। সেতো পূরণ করেছি। এমন রূপও কোনদিন দেখিনি। রণরঙ্গিনী বেশ। মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো! আলতাফ জিজ্ঞেস করল, তুমি নিজে এই লোকটাকে ঘরে নিয়ে এসেছ?

হ্যা, আমি নিজে নিয়ে এসেছি! তোমার কিছু করার আছে?

এ কথা বলোনা! বল, লোকটা জোর করে আমার বেডরুমে ঢুকে পড়েছে! আমি যে বিশ্বাস করতে পারছিনা! তুমি একবার বল, তুমি নিয়ে আসোনি!

কেন বলব? আমি নিয়ে এসেছি, না করব কেন? এখন থেকে সে আসবে যখন ইচ্ছে তখন। আমার ইচ্ছেমত!

কি বললে? বলেই আলতাফ রিনাকে গলা চেপে ধরল। খুন করে ফেলব! আমি জেলে যাব তোমাকে খুন করে! এই তোমার আসল রূপ? দেখিয়ে দিচ্ছি। দুজনে ধ্বস্তাধস্তি লেগে গেল। এক ফাঁকে আলতাফের হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিয়ে রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রিনা।

আলতাফ লাফাচ্ছে, দিশে হারা হয়ে গেছে! কি করবে সে! এ জীবনে বেঁচে থেকে কি লাভ! খুন করে জেলে কাটিয়ে দিব সারা জীবন তাও ভাল! সে বারান্দার এ মাথা থেকে সে মাথা পায়চারি করছে পাগলের মত। দরজা ভেঙ্গে ফেলবে? তারপর রিনাকে খুন করে থানায় গিয়ে সব বলবে! এ সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখে দুজন পুলিশ। পুলিশ ঘরে ঢুকতেই রিনা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। পুলিশ জিজ্ঞেস করল কে তোমাকে খুন করতে চাইছে?

রিনা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এই আমাকে খুন করে ফেলবে। সে যেন এ বাসায় আর না আসে সে ব্যবস্থা তোমরা করে দাও। আমাকে রক্ষা কর!

পুলিশ সব কিছু লিখে নিল। রিনাকে জিজ্ঞেস করল কেন তোমার স্বামী তোমাকে খুন করতে চাইছে?

সে আমার বয়ফ্রেন্ডকে সহ্য করতে পারেনা। আমার বয়ফ্রেন্ডকেও খুন করতে ছুরি নিয়ে এসে আক্রমন করেছিল। আমি বাধা দেয়ায় আমাকেও খুন করতে আক্রমন করেছে।

এদেশে বয়ফ্রেন্ড কোন ব্যাপারই নয়। যার যত বয়ফ্রেন্ড থাকে তার তত দাম বেশি। একটা কাড়াকাড়ি থাকে। কোন কোন স্বামী যখন আপত্তি করে তখনই হয়ে যায় ছাড়াছাড়ি। আইনের চোখে এটা স্বাধীনতা। পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা মানে বিরাট অপরাধ। যার শাস্তি পরিস্থিতি পরিবেশ আর নমুনা সাক্ষীপ্রমানের উপর নির্ভর করে। আলতাফ যে ছুরিটা ব্যবহার করেছিল তা তখনও বারান্দায় পড়েছিল। রিনা সে ছুরিটা দেখিয়ে বলল, এই যে ছুরিটা, যা দিয়ে আক্রমন করেছিল।

জ্বাজ্বল্য প্রমান! সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এটেম্পটেট মার্ডার! বিপদজনক আসামী! আলতাফকে বেঁধে নিয়ে গেল পুলিশ। আলতাফ একটা কথাও বলতে পারেনি। সে জীবিত না মৃত তা বুঝতে পারছেনা। কিসে থেকে কি হয়ে গেল! সে এখন কোথায়! সে অনেকটা অপ্রকৃতস্থ।

পুলিশের গাড়ীতে বসে সে ভাবছে তার স্বপ্নের কথা। কি স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল এই স্বপ্ন নগরে। কত কিছু কামনা করেছিল, কত আশা ছিল। সুন্দর একটা সংসার গড়তে এসেছিল এই প্রবাসে। আজ সবকিছু ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেল। কোন পথই আর খোলা রইলনা ফিরে যাবার!

সাতদিন পর আলতাফ আদালতে মুচলেকা দিয়ে জামানতে বেরিয়ে আসল। সাহায্য করেছে তার বন্ধুরা। তাকে লিখিত দিতে হয়েছে যে সে রিনার বাসার পাঁচশ গজের ভেতর যেতে পারবেনা। হাকিম যা বলেছে তাতেই সে সই করে দিয়েছে। কিন্তু বেরিয়ে প্রথমেই তার মেয়ের কথা মনে পড়ল। এতদিন তার মেয়ে কিভাবে কোথায় ছিল! তার পাশে না শুলে মেয়ের ঘুম আসেনা। একদিকে মেয়ে আর একদিকে রিনা। মাঝখানে আলতাফ। এ নিয়ম চলে আসছে অনেক দিন ধরে। নিয়ম ভেঙ্গে তারা ঘুমাচ্ছে কি করে! তার জায়গায় এখন কে? আসলাম? তার মেয়ে কোথায় ঘুমাবে? আলতাফের মাথাটা আবার ঝিম্ করে উঠল। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার বন্ধু সাদেক নিয়ে এসেছে তাদের মেসে। সাদেকের সাথে পরিচয় এই নিউইয়র্কেই। সাদেক তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গিয়ে আলতাফকে রাস্তার মোড়ে আটকাল। কোথায় যাও?

আমার মেয়েটাকে দেখতে যাব।

না, তুমি তো সেখানে যেতে পারবেনা। আদালতের মানা আছে। গেলে তোমার অসুবিধা হবে। চল, ফিরে চল।

আমার মেয়েকে আমি দেখতে পারবনা?

না, আদালতের অনুমতি ছাড়া দেখতে পারবেনা।

এ কেমন দেশ! কেন এসেছিলাম এ দেশে! বলে ঝর ঝর করে কেদে ফেলল আলতাফ। এই প্রথম তার চোখ দিয়ে জল পড়ল। এতদিন রক্ত জমাট হয়ে ছিল। অশ্রু হয়ে বেরোয়নি। আজ আদরের ধন নয়নের মনি মেয়েটাকে এক নজর দেখারও অনুমতি নেই। আলতাফ পথের উপর বসে পড়ল। মুখ দিয়ে আর কথা বের হচ্ছেনা। সাদেক তাকে ধরে নিয়ে এল মেসে। বলল, চল আমরা আমাদের উকিলের কাছে যাই। আদালত থেকে অনুমতি নিয়ে আসুক। আদালত অবশ্যই অনুমতি দেবে। তারপর তুমি তোমার মেয়ে দেখতে যাবে। এখন চল।

তারপর এক মাস পর অনুমতি মিলল। সপ্তাহে শুধু একদিন কয়েক ঘন্টার জন্য মেয়েকে দেখতে পারবে বা বাইরেও নিয়ে যেতে পারবে। আর রিনা আসলামকে বিয়ে না করেই লিভ টুগেদার করছে। পরে অবশ্য আলতাফের সাথে ছাড়াছাড়ি হবার পর বিয়ে হয়েছে। এবং সেই বাসাতেই রিনা থাকে। এই হল তোমার রিনা ভাবী।

আনিস এতক্ষন স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। জিজ্ঞেস করল, রিনা এমন কাজটা কেন করল? আলতাফের অপরাধটা কি ছিল?

স্বাধীনতা! নারী স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অনেক ভাবেই ভোগ করা যায়। এদেশে নারীরা স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু আমাদের মত তৃতীয় দেশের নারীদের মত এদেশের মেয়েরা এমন জঘন্যভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেনা। তারা সোজাসুজি বলে দেয় তোমার সাথে আর ঘর করবনা। আমি তালাক চাই ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশের নারীরা এদেশে এসে অধিকার এমন ভাবে ভোগ করে যে এদেশের নারীরা চিন্তাও করতে পারেনা। এত সর্বোচ্চ অধিকার ভোগ আমেরিকান নারীরাও করে না।

তাতো হবেই। শত সহস্র বছরের নারী নির্যাতনের প্রতিশোধ নিচ্ছে আমাদের নারীরা এখানে সুযোগ পেয়ে। কারন নারী নির্যাতন আমাদের উপমহাদেশেই বেশী। তাই আমাদের উপমহাদেশের নারীরা সর্বোচ্চ প্রতিশোধ নেবে তাতে এমন আশ্চর্য হবার কি আছে? আনিস বলল।

দেখ, পৃথিবীটা বদলে গেছে, নির্যাতনের ধরণও পাল্টে গেছে। এখন শুধু যে নারী নির্যাতিত হচ্ছে তা নয়, পুরুষও নির্যাতিত হচ্ছে। বিশেষ করে এই পরবাসে। পুরুষরা মুখ খোলেনা। নীরবে সহ্য করে যায়। নারীরা নির্যাতনের কথা প্রচার করে বেড়ায়। তাই নারী নির্যাতনের কথাই সকলে জানে। যারা নির্যাতন করে তাদের উপর প্রতিশোধ নিলে কারও কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু আলতাফের মত একজন নিরীহ মানুষের উপর অকারণে এই প্রতিশোধ কেন? রিনা প্রতিশোধ নেয়নি। প্রতিশোধ নিতে হলে তাকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে। যাদের উপর তার আক্রোশ থাকতে পারে। শুনেছি রিনার দেবর ননদ শ্বাশুড়ি তাকে অনেক জ্বালাতন করত। প্রতিশোধ নিতে হলে তো তাদের উপর নিতে হয়। আলতাফ বেচারা সেই নির্যাতন থেকে তাকে রক্ষা করেছে। তার উপর প্রতিশোধ নেবার প্রশ্নই উঠেনা। আমার মনে হয় অন্য কারণ, অন্য ব্যাপার। এই বলে লতা থামল।

অন্য কি কারন থাকতে পারে?

আমার মনে হয় রিনা স্বার্থপর। সে নিজের স্বার্থ নিয়েই চিন্তা করেছে এবং এই জঘন্য কাজটা করেছে। ওরা ১৯৮৮ সালের স' প্রোগ্রামে দরখাস্ত করেছিল। সেটা নাকি ডিনাই হয়েছে। তাদের কাগজপত্র পাবার আর কোন রাস্তা নেই। আর কোন পথই খোলা নেই। রিনা হয়ত ভেবেছে যে আসলাম এখানকার নাগরিক। তাকে বিয়ে করলে সে গ্রীণ কার্ড পেয়ে যাবে। তার মেয়ের ভবিষ্যতও তৈরি হয়ে যাবে। আলতাফ

নামে যে মানুষটার গলা জড়িয়ে ধরে এখানে এসেছিল সে গোল্লায় যাক। তার নিজের ভবিষ্যত তৈরি করতে হবে। তাতে পৃথিবীর দু'একজন মানুষ মরে যাক বা পাগল হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাক তাতে তার কিছু যায় আসেনা। সে এখন বেশ সুখে আছে। গ্রীণ কার্ড পেয়ে গেছে। কয়েক মাস আগে দেশ থেকে বেড়িয়ে এসেছে। সে এখন আমেরিকান। এটাই তার চাওয়া এবং পাওয়া।

মানুষ কতভাবে কতকিছু পেয়ে যায়!

-২৭-

ছুটির দিন। বাহার তার গাড়ী সারাতে গেছে ম্যাকানিক কাইয়ুমের কাছে। গাড়ী মেরামতের কয়েকটা বাঙালি ওয়ার্কশপ আছে এখানে। বেশিরভাগ বাঙালীর গাড়ী পুরাতন। পুরাতন গাড়ী আর ম্যাকানিকের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকে। কোন কোন ম্যাকানিক অগ্রিম সারাই করে। যেমন আপনি যদি গাড়ীর ব্র্যাক বদল করতে যান তাহলে তারা গাড়ীর আরও কোন্ কোন্ পার্টস বিপদজনক অবস্থায় আছে, এখন না সারালে যে কোন সময় মহাবিপদ হতে পারে। আর সে সব সারাতে গেলে যা খরচ হবে তা দিয়ে আর একটা গাড়ী কেনা যাবে অনায়াসে। যেন ডাক্তার। রোগ নির্নয় করে বলে দিয়েছে। আপনাকে আসতেই হবে বার বার ফিরে ফিরে। কিন্তু কাইয়ূম সে ধরনের কিছু ভবিষ্যতবাণী করে না। কাইয়ুম সবচেয়ে পরিচিত এবং খুব ভাল ম্যাকানিক। প্রায় সব বাঙালিই কাইয়ুমের কাছে যায়। ছুটির দিনে কাইয়ুমের কাছে একটা লাইন থাকে। সকাল নয়টায় বেরিয়ে যাবার সময় বিন্দু মনে করিয়ে দিয়েছে গাড়ী সারিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসবে কিন্তু। আজ ছন্দা ভাবীর ওখানে দাওয়াত। কোথায়ও আবার আড্ডায় বসে যেও না।

বেলা চারটার দিকে বাহার ফিরে এল। ঘরে ঢুকতেই বিন্দু বলল, জান আজকে আমাদের বাসায় একটা পুতুল মেহমান এসেছিল। নিয়ে এসেছিল কে জান? তোমার পেয়ারের আনিস।

কি বলছ? কিসের পুতুল আবার কিসের মেহমান?

আনিস তার এক বই পাগল ভাবীকে নিয়ে এসেছিল তোমার বই দেখাতে। অল্প বয়সের মেয়ে। দেখতে একদম পুতুলের মত।

তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ মেয়েটা সুন্দরী? পুতুল না বলে, বল সুন্দরী।

হ্যা, মেয়েটা সুন্দরী। ওরা দুজনকে যা মানিয়েছে কি বলব তোমাকে! দেখে আমি ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছি। কথাই বলতে পারিনি।

তোমার মুখ দিয়ে বলছ সুন্দরী? তাহলে তো সত্যি সে সুন্দরী। কার স্ত্রী বলেছে? ওর সাথে কোথায় পরিচয়?

সৈয়দ সাহেব না কি যেন বলল নাম, তার স্ত্রী।

ও, আমি তো সে বাসায় একবার গিয়েছিলাম। জামাতের লোক। তার স্ত্রীকে দেখিনি। ঠিক শুনেছ তো?

হ্যা, ঠিক শুনেছি। মেয়েটা বইর পোকা। এখানে বই পায়না। আনিসের কাছে শুনে দৌঁড়ে চলে এসেছে। আমি বলে দিয়েছি যখন তখন এসে বই নিয়ে যেতে। পড়া শেষ হলে ফেরত দিয়ে দেবে।

ভাল করেছ। কিন্তু সৈয়দ সাহেবের স্ত্রী বই পড়ে! পড়লে তো পড়বে ইসলামী বই!

না, এ মেয়ে খুব সৌখিন এবং রুচিবান। কথাবার্তায় খুবই ভদ্র। এসব বই দেখে তার যে কি আনন্দ! আমাকে ভাবী বলে ডাকেনা। আপা বলে ডাকে।

বেশ ভাল সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছ একদিনেই। আনিস তাহলে তোমার উপকারই করল। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝতে পারছিনা। তুমি বলছ খুবই সুন্দরী, আবার বলছ বাসায় আসতে বলে দিয়েছ, এসব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তোমার মতের সাথে তো মিলছে না। এ ধরনের মহিলাদের সাথে তো তুমি যোগাযোগ রাখ না!

কে বলল আমি মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখিনা?

কেউ বলে নাই। কর্মে বুঝেছি।

সবাইর সাথে এমন করিনা। যদি দেখি ছেনালীপনার লক্ষণ আছে তখন করি।

এর মধ্যে কি এমন কিছু নেই?

না, ও খুব ভাল মেয়ে। তাছাড়া আনিস আছে। কোন চিন্তা নাই।

আনিস কি খুব নিরাপদ নাকি?

হ্যা, দেখলেই বুঝা যায়। সে কোন খারাপ কাজ করতে পারে না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে অভ্যস্থ।

যাক, তাহলে একজন নিরাপদ মানুষ পাওয়া গেল।

আসলেও সে ভাল ছেলে। আচ্ছা আমি কাপড় পড়তে গেলাম। তুমিও প্রস্তুত হয়ে নাও।

পার্টি হবে লতিফের বাসায়। এখন পরিচিত মহলে আনিসও দাওয়াত থেকে বাদ পড়ে না। কোন উৎসব নয়। পালাক্রমে। দেয়া নেয়া। এখানে খাদ্যবস্তু সুলভ। মেহমানদারী করতে খুব একটা খরচ হয়না। ঝামেলা হল রান্না করা এবং পরিবেশন করা। বাসনপত্র পরিষ্কার করা। অনেকে কাজ কমানোর জন্য ডিসপোজেবল প্লেট ব্যবহার করে। ঝামেলা অনেক কমে যায়। এখানে মেহমানদারী হয় পালাক্রমে। একজনের বাসায় দু'বার হয়ে গেছে অতএব এবার আর একজনের পালা। লতিফ অনেক দিন ফাকতালে খেয়ে বেড়াচ্ছে। তার স্ত্রী ছন্দা একটু দেমাকী। বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে। কোন দিন রান্না করেনি। রান্না জানেও না। বিয়ের পর বাংলাদেশে অনেক কসরত করেছে। তারপর কোন রকমে চালিয়ে নিয়েছে। রান্নঘরে যেতে না হলেই সে মহাখুশি। তার ধারনা ছিল বিদেশে আসলে আর রান্নাঘরে যেতে হবেনা। তাই তার বাবাকে বলে কয়ে এই বিদেশে আসার ব্যবস্থা। খরচপত্র তার বাবাই বহন করেছে। ভিজিট ভিসা নিয়ে এসে এখন গ্রীন কার্ড পেয়ে গেছে। একটু বেশি হাই ফাই। নিজের সাজপোষাক নিয়েই তার বেশি সময় কাটে। প্রথমত এখানে এসে নিজের টাকা খরচ করে চলতে হয়েছে অনেক দিন। লতিফ কিছুদিন কাজ করেছে একটা কনষ্ট্রাকশন কোম্পানীতে। বেশি পরিশ্রম বলে ছেড়ে দিয়ে একটা রেষটুরেন্টে কাজ করে। বেতন যা পায় তা দিয়ে ঘরভাড়া দেবার পর আর কিছু থাকেনা। নিউইয়র্ক পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বাড়ী ভাড়ার শহর। একজনের রোজগার দিয়ে দিতে হয় ঘরভাড়ায়। দিনরাত হিসাব করে একটা রাস্তা বের করেছে। অবশ্য অনেকেই এই রাস্তাটা অনেক আগে থেকেই ব্যবহার করে আসছে। বেশ লাভজনক। বাসা নেয়ার সময়ই প্রয়োজনের বেশি একটা বেড রুম নেয়। সেটা ভাড়া দিলে অনেক ভাড়া কমে যায়। যারা অঙ্কে খুব পাকা তারাই এই হিসাবটা উদ্ভাবন করেছে। এই অঙ্ক কাজে লাগিয়ে অনেকে অনেক ফল পেয়েছে। সুফল এবং কুফল। তাতে কিছু যায় আসে না। সব কাজেরই একটা সুফল কুফল থাকে। কুফলের কথা ভাবলেই শুধু চলেনা। একটা রিস্ক নিতে হয়।

লতিফ প্রথমত থাকত একটা এক বেডরুমের এপার্টমেন্টে। হিসাব করে দেখেছে যে দু বেডরুমের একটা এপার্টমেন্ট নিয়ে এক বেডরুম ভাড়া দিলে অনেক টাকা বেঁচে যায়। তার পরিচিত আরও দু'একজন এমনি করছে। সেই হিসাব অনুযায়ী তারা বাসা দেখছিল। আর তখনি ছন্দার এক খালার চিঠি নিয়ে রনি নামে এক লোক এসে হাজির । রনি ষ্টুডেন্ট ভিসায় এসেছে। খালা লিখেছে, রনি তার বান্ধবীর একমাত্র ছেলে। কম্পিউটার সায়েন্সে এম এস করতে এসেছে। চার বছর থাকতে হবে। তার থাকা এবং খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দিতে। টাকা পয়সার কোন অসুবিধা হবেনা। তারা বড়লোক। রনির বয়স তেইশ চব্বিশ হবে। একদম নিরীহ গোবেচারা। সে রান্না বান্না জানেনা। তাই একটা পরিবারের সাথে থাকতে চায়। মেসেও থাকতে পারবেনা। কিছুদিন লতিফের লিভিং রুমেই থাকতে হল। তারপর দুবেডরুমের একটা বাসা নিল। সেই থেকে রনি আছে প্রায় এক বছর। অর্ধেক ভাড়া দেয়।

তাতেও খুব একটা সুবিধে হচ্ছেনা। ইচ্ছেমত খরচ করতে পারেনা বলে ছন্দার মুখ ভার হয়ে থাকে। লতিফ আবার হিসেব করতে বসল। হিসেব করে দেখল ট্যাক্সিতে পয়সা বেশি। অনেকেই ট্যাক্সি চালিয়ে অনেক টাকার মালিক। সবচেয়ে সুবিধে হল সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যায়। একদম না দিয়েও মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করা যায়। কারণ এই আয়ের কোন প্রমান নেই। যে কোন জায়গায় কাজ করলে ট্যাক্স কাটার পর খুব বেশি থাকেনা। একমাত্র ট্যাক্সিতেই নিজের থেকে না বললে ট্যাক্স কাটার কোন পথ নেই। বরং সরকারের কাছ থেকে ফেরৎ পাওয়া যায়। অনেকের সাথেই আলাপ করে জানতে পারল কোন কোন দিন দেড়শ'/দু'শ হয়ে যায়। যা লতিফের এক সপ্তাহের বেতন। গাড়ীভাড়া দিয়ে বাকী যা থাকে তা যথেষ্ট। তারপর নেমে গেল ট্যাক্সি নিয়ে। প্রথমত দিনে চালাত। পরে দেখল রাতেই বেশি সুবিধা। ভীড় কম থাকে, কাষ্টমার বেশি, পয়সাও বেশি। তারপর রাতের শিফটে শুরু করল। লতিফ গাড়ী নিয়ে বের হয় বিকেল পাঁচটার সময়। সকাল পাঁচটায় গাড়ী জমা দিয়ে ঘরে ফিরতে সকাল সাতটা বেজে যায়। ঘরে এসেই দেয় ঘুম। উঠে বিকেল তিনটা চারটায়।

এখন ছন্দা ইচ্ছেমত খরচ করতে পারে। মেজাজটাও ভাল থাকে। কারণ টাকাপয়সা সব থাকে ছন্দার একাউন্টে। ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য নিজের একাউন্টে টাকা রাখেনা লতিফ। গত এক বছরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা হয়েছে ছন্দার একাউন্টে। ইচ্ছেমত খরচ করার পরও। কিন্তু রান্নার কাছে যেতে ইচ্ছে হয়না। যেদিন মানুষ দাওয়াত দেয় সেদিন লতিফই বেশির ভাগ কাজ করে।

আনিস যখন এষ্টোরিয়ায় লতিফের বাসায় পৌঁছল তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। বাহার, নিখিল, অজয় আগেই পৌঁছে গেছে। আরও দুজন অচেনা। এখন কফির আড্ডা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী খবর পরিবেশন হচ্ছে। যে যেদিক থেকে যা আহরন করেছে তা পেশ করছে। অচেনা দুজনের সাথে আনিসের পরিচয় হল। একজন কুদ্দুস সাহেব আর একজন সেন বাবু। সেন বাবু একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। এখন রিটায়ার্ড। এদেশে আছেন প্রায় ত্রিশ বছর। এসেছিলেন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে। ফিরে যাননি। লং আইল্যান্ডে বিরাট বাড়ী। একটি মেয়ে। কলেজে পড়ে। আর একটি ছেলে স্কলারশিপ নিয়ে এ্যারোনটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে। এবার ফাইনাল ইয়ারে। আর কুদ্দুস সাহেব একজন ফার্মাসিষ্ট। নিজের ঔষধের দোকান

আছে। এসেছেন ১৯৭৫ সালে। একটি মাত্র ছেলে। এমআইটিতে পড়ছে। কম্পিউটার সায়েন্স।

আজকের এই জলসায় প্রধান খবর হল বাহারের চাকুরি। একটা আমেরিকান কোম্পানীতে চাকরি হয়েছে। এসিস্টেন্ট টু ভাইস প্রেসিডেন্ট। বিরাট কোম্পানী। আমেরিকার প্রায় শহরেই তাদের ব্রাঞ্চ অফিস আছে, প্ল্যান্ট আছে। তারা ম্যানুফ্যাকচারার। পর্দা, পর্দাজাতীয় যত কিছু আছে তার সাথে কিচেন আইটেম। বড় বড় সুপার মার্কেটগুলোতে তাদের তৈরি জিনিস। ম্যানহাটানের অফিসে প্রায় তিন হাজার কর্মচারী। তার বস এডওয়ার্ড ফুর্তাদো। আসল নামে কেউ ডাকেনা। ডাকে এডি বলে। চিরকুমার। এই কোম্পানীতে আছে চল্লিশ বছর। গত সপ্তাহ থেকে বাহার কাজ শুরু করেছে। আটজন কর্মচারি তার কাছে রিপোর্ট করতে হয়। এই কর্মচারীরা বাহারকে দেখে একদম খুশী নয়। হাউ কাম! একটা ইন্ডিয়ান এখানে চাকরি পেল কি করে! তারা নিজেদের মাঝে প্রশ্ন করে। তারাই উত্তর দেয়। একদিন তো একজন প্রশ্ন করেই বসল। তুমি এখানে চাকরি পেলে কি করে? এই প্রথম ইন্ডিয়ান দেখলাম এই কোম্পানীতে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। এত এত দরখাস্তকারী থেকে এডি তোমাকেই নিয়োগ দিল কি করে? এর চেয়ে কি ভাল লোক পায়নি! এমনি অনেক জিজ্ঞাসা তাদের। তাদের চেহারা এবং ব্যবহার দেখলে বুঝা যায় তারা কত রেসিষ্ট। অথচ মুখে বলে সকলের সমান অধিকার, সকলকে সমভাবে বিবেচনা করা হয় ইত্যাদি।

এক সময় খাওয়ার ডাক পড়ল। সেল্‌ফ হেল্‌প। তিনটা টেবিল একসাথে লম্বা করে সাজানো হয়েছে। যার যার হাতে নিয়ে নিচ্ছে। টেবিলের চারদিকেই মানুষ। আনিস প্লেট হাতে নিয়ে আগেই কাবাব নিচ্ছিল। এটা তার খুব পছন্দের। বিশেষ করে টুনা কাবাব। সে যখন ফর্ক হাতে নিয়ে কাবাবের ডিসের কাছে হাত নিল তখন উল্টোদিক থেকে আর একটা ফর্ক এবং হাত এসে পৌছল তার আগেই। আরে! লতাভাবীর হাত! এখানে কি করে! মুখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। লতা ভাবী নয়। মেয়েটা হেসে বলল, সরি। আনিস তাকিয়েই আছে। ঠিক তখনি সেন বাবু এগিয়ে এলেন, বললেন, এ আমার মেয়ে পিঙ্কি। পিঙ্কির দিকে ফিরে বললেন, দিস ইজ আনিস। নিউ কামার ফ্রম বাংলাদেশ এন্ড এ ষ্টুডেন্ট। পিঙ্কি বলল, হাই। আনিসও হাই বলল।

এখানে বলা বাহুল্য, পিঙ্কির জন্ম এদেশে। এদেশে ছেলে মেয়েরা হাই স্কুলে গেলেই আর মাতা পিতার সাথে কোথায়ও বেড়াতে যায়না। বা তারা পছন্দ করেনা। কিন্তু মিসেস সেন মানে নির্মলা দেবী তার নিজের কতগুলো নিয়ম বজায় রাখতে চান। তিনি চান মেয়ে ইন্ডিয়ান কালচার শিখুক, ইন্ডিয়ান ছেলেদের সাথে মিশুক। বিদেশী ছেলে তার পছন্দ নয়। তাই মেয়েকে বলে দিয়েছেন পছন্দ করবে তো ইন্ডিয়ান ছেলে পছন্দ কর। বিদেশী ছেলে নয়। তিনি এই উদ্দেশ্যে মেয়েকে বাঙালী অনুষ্ঠানে অনেকটা জোর করে নিয়ে আসেন। কোন কোন সময় জোরে কাজ হয়না। মেয়ে আসেনা। আজ তিনি বলেছিলেন যে তার বয়সের আরও মেয়ে থাকবে। তার বোর লাগবেনা। এখানে পৌঁছে সে হতাশ হয়েছে। এই অপরিচিত সব মানুষের মাঝে নিজকে বড় একা ভাবছে। কতক্ষণে ফিরে যাবে তার জন্য অতিষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকবার তার মাকে বলেছে, চল, তাড়াতাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু খাওয়া শেষ না হলে তো ফিরে যাওয়া যায়না। বার বারই বলেছে, এই আর একটু পরেই চলে যাব। এক সময় খাবারের ডাক পড়ল।

আনিস যখন টেবিলের অন্য মাথায় তখনও পিঙ্কি আড়চোখে তাকাচ্ছে আনিসের দিকে। পিঙ্কি মনে মনে বলল, এ গ্রেট ফিগার! নায়কের মত চেহারা। নিশ্চয়ই ব্যায়াম করে রেগুলার। লম্বা কত!

খাবার নিয়ে আনিস এক কোণে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। পিঙ্কি কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পিঙ্কি জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন কলেজে?

সিটি কলেজে।

আরে আমিও তো সিটি কলেজে। আপনার কোন সাবজেক্ট?

আইটি।

আমার সোসিওলজি।

তাহলে তো ভালই হল, মাঝে মাঝে দেখা হবে।

পিঙ্কি জিজ্ঞেস করল, কোথায় থাকেন?

ব্রুকলীনে।

কবে এসেছেন বাংলাদেশ থেকে?

মাস তিনেক হল।

বাংলাদেশে নাকি মশার জ্বালায় ঘরেও বসা যায়না। তাই যারা এদেশে আসে তারা আর ফিরে যেতে চায়না - পিঙ্কি বলল। আরাম করে কিছুই করা যায়না। এমন কি টিভিও দেখা যায়না।

কথাটা একদিক দিয়ে ঠিক। মশা বাংলাদেশটাকে দখল করে আছে। মশার জ্বালায় মানুষ ফেরত যায়না একথা ঠিক নয়। মানুষ ফেরত যায়না পেটের জ্বালায়। ডলারের লোভে। আর উন্নত জীবন যাপনের লোভে। যারা বিদেশে আসতে পারেনি তারা তো মশার কামড়ে মরে যায়নি। গা সহা হয়ে গেছে।

এমন সময় ওদিক থেকে কে যেন পিঙ্কিকে ডাকল। পিঙ্কি চলে গেল। বলে গেল সি ইউ এগেইন। আবার দেখা হবে। আনিস এসে যোগ দিল বারান্দায় - চলতি আড্ডায়।

বারান্দায় তখন গল্প চলছে আফ্রিকান-আমেরিকানদের নিয়ে। ইদানিং সরকারি বেসরকারি সব অফিসেই দেখা যায় যথেষ্ট পরিমানে আফ্রিকান-আমেরিকানদের। এর আগে তারা চাকুরি কাজ কর্মের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার ছিল। নতুন আইনের মাধ্যমে তারা চাকুরি পাচ্ছে। বাহারের অফিসেও যথেষ্ট কৃষ্ণবর্ণের কর্মচারি আছে। ওদের ব্যবহার সাদাদের চেয়ে আলাদা। সাদা চামড়ার মানুষ বাহারকে ভাল চোখে দেখেনা। কিন্তু কালোরা খুব খুশি। খুশি এইজন্য যে এই পজিশনে আগে ছিল সাদা চামড়ার মানুষ। এখন অন্তত কালো না হলেও তার কাছাকাছি গায়ের রং। তারা মনে করে এ তাদেরই লোক। বাহারের কাজে এই কালোরা যথেষ্ট সহযোগিতা করে। যাতে চাকরিটা আরও পোক্ত হয়, সুনাম হয়। সুযোগ পেলেই সাদারা কি যে করতে পারে, কি ক্ষতি করতে পারে, কালোদের প্রতি সাদাদের কি সম্পর্ক সব বলে দেয় বাহারকে। সব সময় সাদাদের থেকে সাবধান থাকতে বলে। এখানে গায়ের রংটাই আসল। রংএর খেলা।

রাত দশটার দিকে ঘর একবারে ফাঁকা হয়ে এল। শেষ মেহমান বাহার। সাথে আনিস। গাড়ীতে উঠে বিন্দু বলল, আজকে তো মেহমান দাওয়াত দিয়েছে ছন্দা ভাবীর নতুন গহনা শাড়ী দেখানোর জন্য। অনেক নতুন নতুন গহনা কিনেছে। এত টাকা কোথায় পায় তারা? যারা গাড়ী চালায় তারা সবাই তো বেশ আছে দেখছি। কিন্তু কেউ তো এত গহনা কিনেনি! ছন্দা ভাবী মনে হয় হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেল।

আনিস মাঝে সময় করে লতাকে নিয়ে জ্যাকশন হাইটসে যায়। তার সখের বই, গানের ক্যাসেট ইত্যাদি কেনে। সেদিনও লতার সাথে যাবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

আনিস ফোন উঠাতেই বাহার বলল, চল আনিস, একজন বাঙালীর জানাযায় শামিল হব।

কোথায় বাহার ভাই? কিভাবে মারা গেল?

বয়স হয়েছে, অসুখেই বোধ হয় মারা গেছে।

ভদ্রলোক কি করতেন? ছেলে মেয়ে আছে?

সে ত এক ইতিহাস। তিনি যে কে, কোথাকার মানুষ, কবে এসেছিলেন এ দেশে কেউ জানেনা। কোন বাঙালীর সাথে তার কোন যোগাযোগও ছিলনা। অথচ এই শহরে চল্লিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। লেখাপড়া খুব একটা জানতেন না। গত বছর আচমকা লতিফের সাথে আলাপ। লতিফের ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন ভদ্রলোক। নেশায় টল মল। রাত চারটা। ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়েও পড়ে গিয়েছিলেন। লতিফ ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু চেহারাটা দেখে মনে হল বাঙালী বাঙালী ছাপ। ট্যাক্সি থামিয়ে উঠতে সাহায্য করল। কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করতে বলল, হারলেম। একটা ঠিকানা বলল। ট্যাক্সিওয়ালারা ঠিকানা বলার সাথে সাথেই চিনে নেয়। পথের একটা ছবি ভেসে উঠে চোখের পর্দায়। একটু চলার পর লতিফ জিজ্ঞেস করল, হোয়ার আর ইউ ফ্রম? তুমি কোথাকার মানুষ? লোকটা এত মদ পান করেছে যে তার নিজের বলতে আর কিছু নেই। এ অবস্থায় সব কথা বলে দেয়। লতিফ এ সুযোগটা নিল। একে একে জানতে পারল সে বাঙালী। নাম ফজর আলী। এখানে আছে চল্লিশ বছর। একজন কৃষ্ণাঙ্গিকে বিয়ে করে এই ঠিকানায় বাস করে অনেকদিন থেকে। কৃষ্ণাঙ্গীর দুটা ছেলে মেয়ে ছিল। বড় হয়ে চলে গেছে যার যার পথে। বাংলাদেশে বউ ছিল, একটা ছেলে ছিল। জাহাজে কাজ করত। এখানে এসে আর ফিরে যায়নি। অনেক ঘাটের জল খেয়ে এই মহিলাকে বিয়ে করে এখানে থেকে যায়। নিজের অতীতকে ভুলে যায়। দেশের সাথে, দেশের মানুষের সাথে কোন যোগাযোগই রাখেনি। এক সময় সবাই ধরে নিল সে জীবিত নেই। সেও আর তার অতীতকে নিয়ে ভাবতে বসেনি। নগদ যা পেয়েছে তাই নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। এখন মাঝে মাঝে ভিতরটা হু হু করে উঠে। অতীতকে ভীষনভাবে মনে পড়ে। ফেলে আসা জীবনটাকে একবার তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। যখনই সে সব মনে পড়ে তখনই বেশি পরিমাণে মদ্য পান করে ভুলে থাকতে চায়। আশ্চর্য এই, এই চল্লিশ বছর বাংলায় কথা বলেনি সে। তাতে বাংলা ভুলে যায়নি। একবারে স্থানীয় ভাষায় লতিফের সাথে কথা বলছিল।

তার বাসার সামনে যখন ট্যাক্সি থামল, সে হাটতে পারছিলনা। আকাশ ছোয়া ইমারত। যাবে ২২ তলায়। এলিভেটরের গোড়ায় যেতেই তিনবার পড়ে গেল। ট্যাক্সি লক করে লতিফ তাকে এগিয়ে দিতে গেল। এলিভেটরে উঠে সে বলল, আমাকে ঘরে দিয়ে আস। শেষ পর্যন্ত ঘর পর্যন্ত নিয়ে গেল লতিফ। দরজা খুলে দিল আর এক মাতাল মহিলা। ইউ হেভ কাম ব্যাক? ফিরে এসেছ? আমি তোমার জন্য কত দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আমার তো আর কেউ নেই সঙ্গ দেবার। কুকুরটা মরে গেছে। তোমার সাথে আর ঝগড়া করবনা। এই প্রমিজ। লতিফের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, হু ইজ দিস? এ কে? কোথায় পেলে এই ইয়াং ম্যানকে? ইউ হেলপড হিম! না, তুমি কিছু না খেয়ে যেতে পারবেনা।

ভেতরে আস। তুমি কিছু না খেলে আমি খুব দুঃখ পাব। প্লিজ! আস। দুজনের বয়সই কাছাকাছি। প্রায় আশি। লতিফ ভাবছে কি করবে। এমন সময় ফজর আলী বলল, বোধ হয় আমার ছেলেটা নিয়ে এল আমাকে। এতদিন আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। আজ পেয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো ওদের ফাঁকি দিয়েছি। কিছু দেইনি। রাগ করেছে। আর ফাঁকি দেবনা বাবা! আয়, ঘরে আয়। তুই যা বলবি তাই শুনব। আমি ফিরে যাব তোদের কাছে। আয়, ঘরে আয়।

লতিফের মনটা নরম হয়ে গেল। একটু ভিতরে গিয়ে দাড়াঁল। আর কোন আওয়াজ নেই। হুস নেই বোধ হয়। মহিলা বলল, তুমি কি খাবে? এক পেগ হুইসকি? নাকি অন্য কোন খাবার?

আমি কিছুই খাবনা। আর একদিন আসব তোমরা যখন ভাল থাক। এখন তোমরা ভাল নেই।

তোমার ফোন নাম্বার দিতে পার, যদি কোন আপত্তি না থাকে? ওকে মাঝে মাঝে বশে রাখতে পারিনা। সে অন্য ভাষায় কথা বলে। বোধ হয় তার নিজের ভাষা। তুমি কি তার দেশের মানুষ? তাহলে তোমার নাম্বারটা দিয়ে যাও। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে ফোন করব। তোমাকে দেখলে আমার ছেলের কথা মনে হয়। কোথায় আছে কে জানে!

ফোন নাম্বার দিয়ে লতিফ চলে এল। এরপর মাঝে মাঝে কল আসত। পরশু দিন সেই মহিলা কল করেছে। হি ইজ ইন ডেড বেড। সে মৃত্যুশয্যায়। বিড় বিড় করে তার নিজের ভাষায় কি বলছে কিছুই বুঝিনা। তুমি একটু মেহেরবাণী করে আসবে। অন্তত: কি বলে সেটা তো বুঝতে পারবে। আমি বুঝতে চাই সে কি বলে। প্লিজ, একবার আস।

লতিফ যখন পৌছল তখন ফজর আলী অচেতন। মুখ দিয়ে বিড় বিড় করে কি বলছে। দু একটা শব্দ বুঝা যায়। আমি .. আর যাবনা .. তু...। এক সময় বিড় বিড়ও বন্ধ হয়ে গেল। এম্বুলেন্স আসার আগেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছে।

লতিফ মদিনা মসজিদে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে। মসজিদ কমিটি মৃতের দাফনের ব্যবস্থা করবে। আজ বাদ জোহর তার জানাজা হবে। এখন লাশ আনতে যাচ্ছে মসজিদ থেকে লোকজন। লতিফ আসছে। আমরা এক সাথে যাব। লাশ আনার ব্যাপারে যদি সাহায্য লাগে।

একটু পরেই লতিফ এল তার ট্যাক্সি নিয়ে। ম্যানহাটান পেরিয়ে একটু পরেই বাহার বলল, এখান থেকেই শুরু হয়েছে হারলেম। মৃত্যুপুরী। বলতে পার যমপুরী। এখানে মানুষের মাথা দিয়ে ছেলেরা বল খেলে। কেউ রাতে ঘরে ফিরে না এলে পুলিশে খবর দেয়না, একবারে ফিরে না এলেও খোজ করেনা। ভাবে হয়ত আছে কোথায়ও নয়ত বা খুন হয়ে গেছে। খুন এখানে কোন ব্যাপারই নয়। অহরহ হচ্ছে। কে কাকে খুন করছে তা নিয়ে পুলিশের মাথা ব্যথা নেই। বেশির ভাগ খুনের কোন রিপোর্ট হয়না। নিজেরা প্রতিশোধ নেয় খুন করে। খুনের বদলা খুন। এখানে সাদা রংএর মানুষ পাবেনা। সব আফ্রিকান। কারওর এদেশে থাকার অনুমতি আছে, বেশিরভাগই অবৈধ। কোন কাজ কর্ম খুব একটা করেনা। সরকারের সোসাল খায়। চুরি ডাকাতি ছিনতাই তাদের পেশা। রাস্তাঘাট দেখ, কত নোংরা। শহর থেকে সম্পুর্ন আলাদা। আকাশছোয়া ইমারতের দিকে তাকিয়ে দেখ, সব আগুনে পোড়া। শত শত বিল্ডিং আগুনে পোড়া। লোকজন কেউ থাকেনা। কিন্তু খুনি পকেটমার মাগার আর স্মাগলারদের আশ্রয়স্থল। এই সব বিল্ডিং তারা ব্যবহার করে খারাপ কাজের জন্য। এসব সরকারী দালান। মেরামতের কোন চেষ্টা করেনা।

করলে আবার আগুন ধরিয়ে দিবে। দরজা জানালা খুলে বিক্রি করে। এখানে এসব পুরনো জিনিষ কেনার বেশ কিছু দোকান আছে। তারা পানির দামে কেনে, রং করে বেশি দামে সাপ্লাই দেয়। তাকিয়ে দেখ, একটা বিল্ডিংএ তুমি কোন দরজা জানালা দেখবে না। এমন কি লোহার শিকগুলোও খুলে নিয়ে গেছে।

কলকাতার বাসু এই হারলেমে থাকে। এদেশে এসেই অভ্যেসবশত সস্তা বাসা খুঁজছিল। একদিন একটা বিজ্ঞাপণ দেখে সে খুশিতে নেচে উঠল। এত সস্তায় এপার্টমেন্ট পাওয়া যায়! পয়সা বাঁচানোর জন্য সে যে কোন ধরণের কষ্ট করতে রাজি। তাছাড়া ক্রেডিট কার্ডের কিছু ঝামেলা আছে তার। লাখ খানেক ডলারের ব্যাপার। ঠিকানা বদল করে লুকিয়ে থাকতে চায়। বাসা দেখতে যেমনই হোক, পয়সা বাঁচিয়ে পালাতে পারলেই হল। বিজ্ঞাপনের ঠিকানা নিয়ে সে চলে আসে এই হারলেমে। বাড়ীওয়ালা মানে বিল্ডিং সুপার বলল, তিন তলায় ডানদিকের এপার্টমেন্ট খালি। তুমি গিয়ে দেখে আস। তিন তলায় গিয়ে সে দেখল তিনটা বেড রুম, লিভিং রুম, কিচেন সবই আছে। তবে একটারও কোন দরজা জানালা নেই। সব খুলে নিয়ে গেছে। নীচে এসে বিল্ডিং সুপারকে বলল, স্যার, দরজা জানালা তো কিছুই নেই। সব ফিক্স করে দেবে না?

সুপার বলল, তিন শ ডলার তিন বেড রুম, আমেরিকার কোথায়ও আছে নাকি? তুমি আবার দরজা জানালা চাও! দরজা জানালা থাকলে তো এর ভাড়া হবে বার/তেরশ ডলার।

বাসু হতাশ হয়নি। শুধু মেইন দরজাটা যদি থাকত তাহলেই চলত। কিন্তু ছাড়ার পাত্র নয়। তালে তালে তলে তলে খুঁজতে লাগল। কয়েকদিন পর আর একটা বিজ্ঞাপণ দেখল। এটা হারলেমের মাঝামাঝি জায়গায়। সুপারের সাথে দেখা করে বলল, আমি তোমাদের এপার্টমেন্ট দেখতে এসেছি।

সুপার বলল, একতলায় ১১১ নম্বর এপার্টমেন্ট। আগের ভাড়াটে এখনও যায়নি। কাল যাবে। তুমি গিয়ে আমার কথা বল। দেখে আস।

বাসু ১১১ নম্বরে গিয়ে দরজায় নক করল। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, হু ইজ ইট?

আমি এপার্টমেন্ট দেখতে এসেছি, সুপার পাঠিয়েছে।

দরজা খুলে গেল। বাসু চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল! প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, বিরাট দেহ নিয়ে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে পুরোপুরি মানুষ বলা যাবে কিনা ভাবছে। চেহারাটা হুবহু গরিলার মত। কলাগাছের মত হাতের সাইজ। বলল, ওকে, ভেতরে এসে দেখ।

এক বেডরুম। লিভিং রুম, কিচেন সব আছে। দরজা জানালাও আছে। যদিও ধাক্কা দিলে পড়ে যাবার সাম্ভাবনা শত করা নব্বই ভাগ। ভাড়া মাত্র আড়াইশ ডলার। এই ভাড়ায় এর বেশি ভাল আশা করা যায় না তা বাসু জানে। সিদ্ধান্ত নিল সে এই বাসা নেবে। যখন বেরিয়ে আসছে তখন সেই গরিলা জিজ্ঞেস করল, তোমার পছন্দ হয়েছে?

হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। আমি এ বাসা নেব।

এই জানালায় যে গ্রীল দেখছ তা আমার নিজের কেনা, আমি নিজে লাগিয়েছি। তুমি এই বাসা নিলে স্থির কর এই গ্রীলগুলো তুমি রাখবে কিনা। যদি না রাখ তাহলে আমি আমার জিনিষ খুলে নিয়ে যাব।

বাসু ভাবল, নীচের তলায় বাসা। এখানে চোর ডাকাত যথেষ্ট পরিমানে আছে তা জেনেই সে এখানে আসবে। জানালায় যদি গ্রীল না থাকে তাহলে ঘরের কিছুই থাকবেনা শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত। গরিলা যদি তার গ্রীল খুলে নিয়ে যায় তাহলে বাসুর নিজের কিনতে হবে,

তারপর আবার ফিক্স করার জন্য লোক লাগবে। মহা ঝামেলা। গরিলাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কত টাকা খরচ হয়েছে এই গ্রীল লাগাতে?

আমার তো আশি টাকা লেগেছে। তুমি রাখলে চল্লিশ টাকা দিলেই চলবে।

বাসু অংক করল। অর্ধেক দাম। এখানে চল্লিশ টাকা লাভ। বলল, আমি আগে সুপারের সাথে কথা বলে নিই, তারপর তোমাকে দাম দিয়ে দেব।

সুপারের সাথে কথা বলে বাসু এক মাসের অগ্রীম দিল। ফিরে এসে গরিলাকে দিল চল্লিশ ডলার।

পরের দিন বাসু তার বিছানা নিয়ে নতুন বাসায় উঠল। সব ঠিক ঠাক করে সুপারকে বলল, আমি জানালার গ্রীলগুলো রেখে দিলাম। মাত্র চল্লিশ ডলার দিয়েছি।

কিসের গ্রীলের কথা বলছ তুমি, সুপার জিজ্ঞেস করল।

ওই যে, জানালায় যে গ্রীল আছে সেগুলো কিনে নিলাম।

জানালার গ্রীল তুমি কিনে নিলে? কার কাছ থেকে?

আগের ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে।

বল কী তুমি! বিল্ডিং ম্যানেজমেন্টের জিনিস তুমি ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে কি করে কিন? সে তোমাকে ঠকিয়ে গেছে। তুমি একটা বোকা।

বাসু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এই লোকশানটা অন্যভাবে পুষিয়ে নেবার তালে আছে। এখনও সেই বাসায় থাকে।

এখানে ঘরের দরজার পাশে মৃতদেহ পড়ে থাকলে পুলিশ কল করে খুব কম। পুলিশে রিপোর্ট করলে পুলিশ আসে খুব ভয়ে ভয়ে। এখানে সব চেয়ে বেশি পুলিশ খুন হয়। তাই পুলিশ যখন আসে তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই আসে। হারলেমের অধিবাসী সবচেয়ে গরীব, সবচেয়ে দাঙ্গাবাজ। অন্য জায়গা থেকে খুন করে এই হারলেমে মানুষ লুকিয়ে থাকে অনায়াসে। পুলিশ খুব একটা গা করেনা।

একটা রাস্তার মোড়ে আসতেই বাহার বলল, লতিফ, এখানে একটু থাম। আনিসকে ব্যবসার জায়গাটা দেখিয়ে নেই। জীবনে হয়ত আর কোন দিন এখানে নাও আসতে পারে। তিন রাস্তার মোড়ে একটা রেস্টুরেন্ট দেখিয়ে বলল, এই যে রেস্টুরেন্ট দেখছ তার সামনের খালি জায়গাটা হল সবচেয়ে দামী বাজার।

এখানে জায়গা কই, আবার বাজার কিসের? আনিস জিজ্ঞেস করল।

এইযে রেস্টুরেন্টের সামনে যে ফুট পাথ, তার পাশে ঐ যে গাছটা। তার নীচে খালি জায়গার বাতাসটা - এখানে কোন ঘর নেই, কিছুই নেই, শুধু বাতাস আছে, সেই বাতাসটাই বাজার।

আপনার মাথা খারাপ না আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুঝতে পারছিনা বাহার ভাই। আপনি একবার বলছেন বাজার, আবার বলছেন বাতাস, এসব কি বলছেন?

আমি ঠিক বুঝাতে পারছিনা তোমাকে। গাছটার নীচে যে খালি জায়গাটা, মানে খোলা জায়গার বাতাসটা, সেটাই বাজার।

বাতাস আবার বাজার হয় কি করে? কিসের বাজার?

না, এখানে কেউ কোন জিনিস নিয়ে বসেনা বিক্রি করার জন্য। ওখানকার বাতাসটা বিক্রি হয় মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। এই বাতাসটা প্রতি বছর হাত বদল হয়, কয়েকবার মানুষ খুন হয়। যে জিতবে সেই দখলে রাখবে। এই খালি জায়গা থেকে বছরে আয় হয় কয়েক মিলিয়ন। এখন নাকি বিলিয়নে গিয়ে পৌঁছেছে। যারা বেঁচে থাকে তারাও

বেশিদিন নিজের দখলে রাখেনা, মানে রাখতে হয় না। কয়েক মিলিয়ন নিয়েই সটকে পরে। বিক্রি করে দেয়। যারা বেশীদিন ধরে রাখতে চেয়েছে তারাই খুন হয়ে গেছে।

ব্যবসাটা কি সেটা বলুন না?

পৃথিবীর নিষিদ্ধ জিনিস হেরোইন। তোমার কত প্রয়োজন, কবে প্রয়োজন, এখানে আসলে হবে। এই যে রেস্টুরেন্টটা দেখছ, সেখানে বস, চা খাও। কেউ একজন কথা বলবে। তারপর গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াও। হাতে দিয়ে চলে যাবে। রাত দিন চলছে এ ব্যবসা এখানে। পুলিশ আসেনা, আসবেনা। তাদেরও জানের ভয় আছে। অগত্যা আসতে হলে তারা আগে জানান দিয়ে আসে। বলে, আমরা আসছি, বেশিক্ষন থাকব না। তখন ব্যবসায়ীরা চা নাস্তার দিকে নজর দেয়।

গত বছর একদিনে সতের জন খুন হবার পর নিউইয়র্ক টাইমসে লিখেছিল সব ঘটনা। লিখেছিল এই বাতাস বাজার থেকে এ পর্যন্ত কত জন মিলিওনিয়ার হয়েছে, বিলিওনিয়ার হয়েছে, কত জন খুন হয়েছে, কার হাতে কত দিন রাজত্ব ছিল। এখন কার হাতে। পুলিশ কত জন খুন হয়েছে। সব বিশদ ভাবে লিখেছিল।

ফজর আলীর বাসার সামনে এসে পৌঁছল তারা। লতিফ রাস্তার পাশে গাড়ী পার্ক করল। তারপর গাড়ীর রেডিওটা খুলে হাতে একটা ব্যাগে নিয়ে নিল। আনিস জিজ্ঞেস করল, এটা নিচ্ছেন কেন?

আরে বাবা, ফিরে এসে গাড়ীর কাচ ঠিক পাব কিনা কে জানে। অনেক সময় বডিও খুলে নিয়ে যায়। বডি পার্টস বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দোকানে পাওয়া যায়। এখানে দুটো সিকির জন্য তোমার গাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গবে। যা মেরামত করতে দুশ লাগতে পারে, পাচশ ও লাগতে পারে। নির্ভর করে মেহেরবানী করে তিনি কোনটা ভাঙ্গবেন। যদি সাইড জানালা ভাঙ্গে তাহলে আড়াই শ, যদি উইন্ড শিল্ড ভাঙ্গে তাহলে পাচশ। ভিতরে যদি রেডিও দেখে তাহলে নির্ঘাত ভাঙবে। প্রথম টার্গেট রেডিও। ট্যাক্সি হওয়াতে গাড়ীটা হয়ত থাকবে। প্রাইভেট কার হলে সন্দেহ ছিল।

একটা সিকির জন্য এত দামী গ্লাস ভাঙবে?

যে ভাঙ্গে তার সে চিন্তা করলে চলবেনা। এটা তার প্রফেশন। তার দরকার একটা সিকি। এ জন্য তোমার কত ক্ষতি হল তা তার জানার প্রয়োজন নেই।

ঘরে গিয়ে দেখে মসজিদ কমিটির লোকজন এসে গেছে। কয়েকজন মিলে তার দেহ একটা ভ্যানে উঠানো হল। সে ভ্যানটা মসজিদের, লাশ বহন করার জন্য। মসজিদের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। গোসল করিয়ে জানাজা শেষে নিয়ে গেল স্ট্যাটেন আইল্যান্ড গোরস্থানে। তার আত্মীয়স্বজন হয়ত জানে সে বহু আগেই মরে গেছে। তার শেষ কৃত্যে কোন আপনজন ছিলনা। উপস্থিত সব বাঙালিই ছিল তার আপনজন। কে কখন কার আপন হয় নিজেও জানে না!

-২৯-

সকাল নয়টায় বেরিয়ে পড়ল আনিস। কলেজের উদ্দেশ্যে। আজ ওরিয়েন্টেশন। কাল থেকে ক্লাশ শুরু। সিটি কলেজটা ম্যানহাটানে। আগেও দুএকবার গেছে আনিস। একবার ফরম আনতে, আর একবার ফি জমা দিতে। ফি'র টাকা চাচা দিয়েছে।

কলেজে পৌঁছে দেখে এলাহি কান্ড। মনে হয় যেন মেলা বসেছে। ছেলেমেয়েরা যেখানে সেখানে আড্ডা দিচ্ছে, হৈ চৈ করছে, কেউ কেউ

হেসে লুঠোপুটি খাচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে আনিস বুঝতে চেষ্টা করছে অবস্থাটা। কোন দিকে যাবে ভাবছে। এখানে তার পরিচিত কেউ নেই। অথচ মনে হচ্ছে এখানে নিজেদের মানুষই বেশি। বেশিরভাগই এশিয়ান ছাত্র ছাত্রী। সে নোটিশ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। তার ক্লাশ কোন হলে তা খুঁজে দেখছে। ডানদিক থেকে একটা হাসির কল কল ধ্বনিতে সে চোখ ফেরাল। দেখে পিঙ্কি একটা ছেলের সাথে কোলাকুলি করছে আর হেসে লুটিয়ে পড়ছে। ছেলেটা বোধ হয় এ দেশি হবে।

পিঙ্কি এখন জুনিওর। আনিস মাত্র ফ্রেসম্যান। জুনিওর মানে আরও দুবছর। আনিস হা করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। বুঝতে চেষ্টা করছে তাদের বন্ধুত্ব কত গাঢ়। কোলাকুলি শেষ হলে একজন আর এক জনের হাত ধরে এগিয়ে আসছে এদিকেই। এর মাঝে আরও দুটা ছেলে বামদিকে থেকে আসছে। চাইনীজ চেহারা। পিঙ্কির সামনে পড়তেই একজনকে হাই বলে একবারে জড়িয়ে ধরল পিঙ্কি। জড়াজড়ি শেষে ছেলেটা সোজা চলে গেল। বলে গেল, সি ইউ ইন দা ক্লাশ। ক্লাশে দেখা হবে।

আনিস ভাবছে পিঙ্কিকে ডাকবে কিনা। ডাকতে হলনা। পিঙ্কি আনিসকে দেখেই তাড়াতাড়ি করে কাছে এল। হাই! হাও ইজ ডুয়িন? কেমন আছ?

ভাল আছি

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে পিঙ্কি পরিচয় করিয়ে দিল - দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড ব্রায়ান। ব্রায়ানকে বলল, দিস ইস আনিস, এ ফ্রেশম্যান।

পিঙ্কি জিজ্ঞেস করল পেয়েছেন আপনার ক্লাশ কোথায় হবে?

না এখনও দেখতে পারিনি।

তাহলে আমি বলে দিই। আইটির ক্লাশ তো? এই যে ১২১ নং রুমে।

আপনি কি করে জানেন?

আমি আগেই দেখে গেছি। আমাদের ক্লাশ দেখতে এসে আপনারটাও দেখে গেছি। আজ আর কোন ক্লাশ নেই। চলুন ক্যাফেটেরিয়াতে। কফি খাব। বলে তিনজন রওয়ানা দিল। মাঝ পথে ব্রায়ান চলে গেল তার আর এক মেয়ে বন্ধুর সাথে।

একটা আনন্দের হিল্লোল বইছে। সকলেই আনন্দে মেতে আছে। মনে হয় এখানে সবাই এসেছে আনন্দ করতে। লেখাপড়া করতে নয়। জোড়ায় জোড়ায় দলে দলে মেতে আছে।

ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে দেখে একবারে ভর্তি। কোন সিট খালি নেই। লাইনে গিয়ে ডোনাট আর কফি নিল। আনিস আগে থেকে প্রস্তুত ছিল। পিঙ্কিকে পয়সা দেবার সুযোগই দেয়নি। কফি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সিট খালি হয় কিনা। এর মধ্যে একটা সিট খালি হল। আনিস বলল, আপনি বসে পড়ন।

পিঙ্কি বলল, না, আপনি বসুন। আমি দাঁড়িয়েই খাই।

না, আপনি বসুন, আমি দাঁড়িয়ে খাব।

এক সময় আনিস পিঙ্কির হাত ধরে বসিয়ে দিল।

কফি খাওয়া হলে পর পিঙ্কি বলল, আজ তো মজা করার দিন। এখন কি করা যায় বলুন তো?

আনিস ভাবছে কি উত্তর দিবে।

চলুন একটা মুভি দেখি। ভাল একটা মুভি চলছে। পরে আর সময় করা যাবেনা।

হ্যা, যেতে পারি। যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

চলুন তাহলে, এই একটার সময় শো আছে।

৫৭ স্ট্রিট আর ফিফথ এভিনিউতে একটা মুভি থিয়েটারে তারা টিকেট কেটে ঢুকে পড়ল। নাম্বার দেখে সিট নিয়ে ওরা বসল। তখন পর্দায় বিজ্ঞাপন চলছে। আনিস বসার সাথে সাথেই একটা সুগন্ধি এসে নাকে ধাক্কা দিল। বামদিকে দেখল এক কৃষ্ণবর্ণ মহিলা।

পিঙ্কির হাত যখন তখন ছুয়ে যাচ্ছে আনিসের হাত। মনে হয় অনেক দিনের চেনা তারা। এক বারে সহজ মেলা মেশা। মাঝে মাঝে গায়ের গন্ধ এসে ঝাপটা দিচ্ছে আনিসের নাকে, বুকে। কখনও শ্বাস প্রশ্বাস গায়ে লাগছে। সে আনমনা হয়ে যায় কখনও। দু'ঘন্টা পর মুভি দেখে বেরিয়ে এল তারা।

বেরিয়েই পিঙ্কি বলল, আইসক্রীম খাব। তারপর বাড়ী ফেরা যাবে ধীরে সুস্থে। আজ তাড়া নেই।

পথের কোনে একটা দোকান থেকে একটা আইসক্রীম নিল। পয়সা আনিসই দিল। সে নিজে আইসক্রীম খায়না। ওটা নাকি মেয়েদের খাবার। পুরুষরা আইসক্রীম খেলে তার কাছে মনে হয় মেয়েলী স্বভাবের। পিঙ্কির অনুরোধেও আনিস নেয়নি।

এবার চলুন সাবওয়ের দিকে যাওয়া যাক। তারা একসাথে সাবওয়েতে উঠল। আনিস নেমে পড়ল নষ্ট্রেন্ড এভিনিউতে। চাচীর সাথে দেখা করতে হবে। চাচী বলেছিলেন প্রথম যেদিন ক্লাশে যাবে সেদিন আমাদের সাথে ডিনার করবে।

চাচা চাচীর সাথে ডিনার করে বাসায় পৌছে মনে পড়ল, আজকে তো লতাভাবী আসেনি। আসার কথা নয়। তাই ঘরের জিনিষ পত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমান ঠিকই বলেছিল, এখন ভাবী সব ঠিক করে দিয়ে যায়, খুব ভাল আছিস। যখন ভাবী আসবে না তখন দেখবি খুব খারাপ লাগবে। মনটা একবারে খারাপ হয়ে গেল তার। কোথায় যেন কি একটা নেই। কি নেই তাও বুঝতে পারছেনা। আমান ঘরে নেই। চার্চ এভিনিউ থেকে ঘুরে আসবে ভাবছে আনিস। হঠাৎ চোখ গেল টেবিলের দিকে। একটা চিঠি। দেখলেই বুঝা যায় বাংলাদেশের। বাংলাদেশের খামগুলো পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খাম থেকে আলাদা। খামের চারদিকে লাল নীল রং করা থাকে। কাগজটা সস্তা। দেখলেই চেনা যায় এর মাঝে বাংলা গন্ধ। তাড়াতাড়ি খামটা হাতে নিয়ে দেখল। হ্যাঁ, তার নামেই এসেছে। নিশ্চয়ই মা লিখেছে। মা'র হাতের লেখা সে চিনে। গুটি গুটি অক্ষরে লেখা। একটা আলাদা স্টাইল। তাড়াতাড়ি খামটা খুলল।

দু'টা পাতা বেরিয়ে পড়ল। প্রথম পাতা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল। প্রবাসী ছেলের কাছে বাংলাদেশের মায়েরা যা লেখে তা সবাই জানে। মায়ের কোন অসুবিধা নেই। পাশের বাড়ীর জমিরের স্ত্রী আর মেয়েরা মা'র দেখাশোনা করে। জমির রিক্সা চালায়। জমিরের স্ত্রী আনিসের মায়ের কাজ করে বহুদিন থেকে। খুব বিশ্বস্ত। ছোট ছোট মেয়ে দুটো কখন যে বড় হয়ে গেল। তারাও মায়ের খেদমত করে। আসার সময় জমিরের স্ত্রীকে আনিস বলে এসেছে, মাকে তোমাদের কাছেই রেখে গেলাম। তোমার বেতন এখন থেকে দ্বিগুন করে দিলাম। মাকে খুশি রাখলে তোমাকেও খুশি করব। জমিরের বউ বলেছিল, আমার নিজের মা নেই। তুমি মনে করো আমি আমার মা মনে করেই সেবা যত্ন করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমার মেয়েরাও তো আছে। কোন অসুবিধা হবেনা। মায়ের চিঠিতেও তাই লেখা আছে। কোন অসুবিধা হচ্ছেনা। শুধু আমার জন্য চিন্তা।

প্রথম পাতার শেষেই ইতি টেনে লিখেছে - তোমার মা।

পরের পাতাটা হাতে নিয়ে সে থ হয়ে গেল। অলকার চিঠি! কোন সম্বোধন নেই, ইতি অলকা। পুনশ্চ: এই ঠিকানায় চিঠি দিলে আমি পাব। উকীলের মেয়ের ওকালতির চিঠি! কি চালাক! মার চিঠির সাথে পাঠিয়েছে। মা এখনও তাহলে আশা ছাড়েনি! মায়ের ইচ্ছা ছিল অলকাকে বিয়ে করি। অলকার বাবা মাও রাজি ছিল। একই পাড়ায় বাস। অলকার মায়ের সাথে অনেক দিনের পরিচয়। আনিস রাজি না হওয়ায় অনেক পাত্রীর খবর দেয়া হল, অনেক পাত্রী দেখে কাউকে সে পছন্দ করতে পারেনি। মায়ের পছন্দ এখানেই। যখন কথা উঠল আমেরিকায় চলে যাচ্ছে তখন থেকেই দু পরিবার উঠে পড়ে লেগে গেল। কত প্রশ্ন। কোন্ দিক দিয়ে তোর পছন্দ হয়না। অলকা কত সুন্দরী। কলেজে পড়ে। এমন একটা সুন্দরী বউ আমি ঘরে দেখতে চাই। আরও কত কি! প্রতিবারই আনিস বলত, এখন বিয়ে করবনা। এখন বিয়ে করলে সব গন্ডগোল হয়ে যাবে। ফ্রি চলাফেরা করা যাবেনা। আরও লেখাপড়া করব। আমেরিকা যাবার পর বিয়ে করব। মাঝে মাঝে তার পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিত অলকাকে। কোন একটা ছুতোয়। কথা বলত ঘন্টার পর ঘন্টা। তাতে মা ধরে নিয়েছিল আমি অনেকটা রাজি। লটারী পাবার পরই মা বিয়ের জন্য উঠে পড়ল। যাবার আগে বিয়ের কাজটা সেরে যাওয়াই উচিত। আমি কবে বাঁচি কবে মরি ঠিক নেই। সোনা আমার, সব ঠিক ঠাক। তুই একবার হা বললেই হয়। আনিস রাজি হয়নি। আসল কথা তো মাকে বলতে পারেনি। সব দিক দিয়েই সব ঠিক ছিল। শুধু একটা দিক ঠিক ছিলনা। যে দিকটা দুটি জীবনকে এক সাথে গাথতে পারে।

অলকার গৃহশিক্ষক ছিল হাসান। আনিসের সাথে পরিচয় ইউনিভার্সিটিতে। হাসান ইতিহাসের ছাত্র। আলাপে জানতে পারল সে কাছাকাছিই থাকে। একটা টিউশানি করে। আসাদ উকিলের মেয়ে অলকা তার ছাত্রী। সেই থেকে বন্ধুত্ব। যখন তখন দেখা হত। মনের কথা বলত। অলকার সাথে তার প্রেমের কথাও বলত। কতটুকু এগিয়েছে, কোন্ দিন কি কথা হল, কতটুকু এগিয়ে গেছে সব বলত। অলকা জানতনা হাসান আনিসের পরিচিত। তাদের সব কাহিনী জানে। জেনেশুনে এমন একটা মেয়েকে নিজের সঙ্গিনী করার চিন্তাই করতে পারেনা আনিস। কোন কোন মেয়ে অনায়াসে কয়েক জনের সাথে প্রেম প্রেম খেলে যেতে পারে।

কলেজে রিমার সাথে আনিসের পুরোপুরি প্রেম হয়েছিল। এক সময় ভেবেছিল রিমাকে সে বিয়ে করবে। দু বছর পর যখন দেখল রিমা আর একজনের সাথেও খেলছে, তখন সরে পড়া ছাড়া উপায় ছিলনা। আরও কত মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছে, অনেকের সাথে গভীরে পৌঁছেছে। কিন্তু মনের মত কাউকে পায়নি। কারও নাকটা চে া, কারও হাসিটি সুন্দর নয়, কারও চুল নেই। গায়ের রং সুন্দর হল তো দেহের গঠন একদম বাজে। সবদিক দিয়ে সে একজনকেও পায়নি। নিজকে সম্পুর্ণরূপে কোথায়ও ধরা দিতে পারেনি। অলকার চিঠি খানা তাকে উদাস করে দিল। অতীতের ছোটখাটো ঘটনাগুলো আজ মনের গভীর থেকে উঁকি দিতে লাগল।

-৩০-

নভেম্বর মাস। ১৯৯২ সাল। আজ প্রথম সাহিত্যের আসর। অবশ্য তার আগেই মাঝে মাঝে সাহিত্যামোদিরা কোন কোন বাসায় আড্ডা

দিতেন। বিচ্ছিন্ন ভাবে। কোন নিয়মের মধ্যে নয়। অনেকে জানেও না কোথায় কবে সাহিত্যের আড্ডা হয়। বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের মানুষই তা করত। বাংলাদেশি কেউ দাওয়াত পেয়েছে বলে জানা যায়নি।

আনিস ঠিকানা নিয়ে রওয়ানা দিল। কুইন্সে তারেক মাহবুবের বাসায়। তারেক একটা ট্র্যাভেল এজেন্সির মালিক। প্রবাসের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমত জয়েন্ট ব্যবসা করা অথবা কর্মচারি হিসেবে কাজ করা, পরবর্তিতে নিজে আলাদা ব্যবসা শুরু করা। তারেকও তাই করেছে। প্রথমত কাজ করত একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে, এখন তার নিজের এজেন্সি। ট্র্যাভেল এজেন্সি ব্যবসাটা কিভাবে যে টিকে আছে তা অংক করতে গেলে একদম মিলেনা। এখানে কানে কানে পাঠককে বলি রাখি, আমি কিন্তু ৩০ পেয়ে মেট্রিক পাশ করেছিলাম। তারপর আর ও রাস্তায় পা মাড়াইনি। অঙ্কের প্রতি বিমুখ সেই স্কুল থেকে। যেদিন শেফালি বলেছিল, অংক করে কি হবে। এগুলো করে মাথা নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুনা। শেফালি অবশ্য এক বছরের মধ্যেই স্বামীর ঘরে চলে গেল। তার আর প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে আটকে যাই। যেমন এই ট্র্যাভেল এজেন্সির হিসাবটা। এখানে বাঙালী মালিকাধীন গোটা দশেক ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে। টিকেট বিক্রি করলে টিকেটের দামের ১০% কমিশন পায় এই এজেন্সিগুলো। বেশিরভাগ গ্রাহক বাঙালী। বাঙালীরা বাংলাদেশে খুব একটা যায়না বা যেতে পারেনা। কারন অনেকের কাগজ নেই। এখানে যত বাঙালী আছে তা দিয়ে ট্র্যাভেল এজেন্সিগুলোকে ভাগ দিলে একটা এজেন্সির ভাগে পড়বে বড়জোর ১০টা। এই দশটা গ্রাহক দিয়ে ব্যবসা চলতে পারেনা। বিশেষ করে আকাশচুম্বি ঘরভাড়া। তাই তাদেরকে অন্য ব্যবসা রাখতে হয় সাথে। আর সে ব্যবসাগুলো খালি চোখে দেখা যায়না। অন্য চোখ লাগে। এই যেমন একজন বাংলাদেশে যাবে, টিকেট ক্রয় করল ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। তারপর দেখা গেল যে পরিমাণ টাকা টিকেটের জন্য লাগবে তার কয়েকগুণ টাকা ক্রেডিট কার্ডে চার্জ হয়ে আছে। অনেকেই ক্রেডিট কার্ডের মাসিক স্টেটমেন্ট মন দিয়ে দেখেনা। তারা মনে করে যে টাকা তো আর আমার পকেট থেকে যায়নি, কাজেই মাসিক স্টেটমেন্ট কি পাঠাল তা দেখার দরকার কি। সে জানেনা তার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আর একজন বড়লোক হবার রাস্তাটা তৈরি করে ফেলেছে। এক সময় এসব ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি ধরা পরে কয়েকটা এজেন্সি বাতিল হয়ে গেছে বা জরিমানা দিয়েছে। কারও বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। কেউ উদাও হয়ে গেছে। আরও আছে ইধারকা মাল ওধার করা। আদমের ব্যবসা ছাড়া তো ট্র্যাভেল এজেন্সি হতেই পারেনা। এই ব্যবসাটার ব্যাপারে অনেকের অনেক রকম অভিজ্ঞতা আছে। কায়দা কানুন জানা আছে। সেই কায়দা কানুন কাজে লাগিয়ে যথেষ্ট পরিমানে ডলার আমদানি হয়। অবশ্য তারেক এখনও এসব কিছু করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সে একজন সমাজকর্মী। সমাজের সব কাজেই সে জড়িত থাকতে চায়। তার ব্যবসার প্রয়োজন। সে সত্যি একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে সে মানুষের সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখে। যে যখন কোন অনুষ্ঠান করবে, তারেক ডোনেশন দেবে। কেউ নতুন এসেছে, থাকার জায়গা নেই, তারেকের ওখানে অস্থায়ী কিছুদিন ব্যবস্থা হবে।

তারেক সাহিত্যিক নয়, সাহিত্যামোদি নয়, এমন কি একটা লেখা পড়েছে বলেও জানা যায়নি। তারপর ও সে থাকবে। তার নামের প্রয়োজন। টাকা লাগে লাগুক।

তারেকের বাসা খুজে পেতে আনিসের বেশ সময় চলে গেল। যখন গিয়ে পৌঁছল তখন আসর পুরোপুরি জমে গেছে। সর্বজনাব জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, এম বাহাউদ্দিন, হাসান ফেরদৌস, হুমায়ুন, হাসান আল আব্দুল্লাহ, আজাদ আহম্মদ, আজাদ শিশির,রতন তালুকদার, এম,এম মহসীন, তারেক মাহবুব এবং আরও দুএকজন যাদের নাম আর মনে নেই।

আসরে সকলেই একমত প্রকাশ করেন যে এখানে সাহিত্যের একটা আড্ডার প্রয়োজন। যেখানে নবীন প্রবীন কবি সাহিত্যিকরা এক সাথে বসে তাদের লেখার উপর আলোচনা, সমালোচনা করবে। লেখার উপর আলোচনা না হলে নিজের ভুল বা দুর্বলতা ধরা যায়না। নতুন লেখার উপর আলোচনা হলেই লেখার মান উন্নয়ন হবে। এর নামকরণ করা হয় 'যুক্তরাষ্ট্র সাহিত্য পরিষদ'। বাহারের প্রস্তাবে সবাই একমত প্রকাশ করেন যে এখানে কমিটি করতে গেলেই একটা দলাদলির সৃষ্টি হয়। অতএব কোন কমিটি না করে একজন আহ্বায়ক থাকবে। প্রতি মাসের শেষ রবিবারে আসর বসবে। প্রতিটি আসরের জন্য একজন করে আহ্বায়ক থাকবেন। যিনি নিজের ইচ্ছেমত আসর পরিচালনা এবং পরিবেশনার দায়ীত্ব পালন করবেন। যে মাসে যিনি আহ্বায়ক হবেন তিনি তার দায়িত্বে সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদিকে আমন্ত্রণ জানাবেন। আসর সারাদিনব্যাপী চলবে সকাল দশটা থেকে। পিকনিক স্টাইলে খাওয়া দাওয়া চলবে সারাদিন।

সেই থেকে সাহিত্য পরিষদের যাত্রা হল শুরু।

প্রতি মাসে একজন করে স্বতস্ফুর্তভাবে আসর করার জন্য এগিয়ে আসে।

-৩১-

বরবাদীর দেহরক্ষী আহাম্মদ আলীর কাগজ পাবার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। এতদিন অন্যের কার্ডে কাজ করে এসেছে। এখন কাগজ পাবার একটা ব্যবস্থা হবে। একটা পাত্রীর সন্ধান মিলেছে। কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ। এই বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন সৈয়দ মুক্তাদির। তার ঘরে বসে যখন এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তখন লতা রান্নাঘরে। তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছে একটা শুভবিবাহ হতে যাচ্ছে। দিন তারিখ সব ঠিক। লতার ইচ্ছে হয় এসব অনুষ্ঠান দেখার। সৈয়দ সাহেব রাজি হবে না তা সে জানে। তাই আনিসের সাথে কথা প্রসঙ্গে বলল। পারলে দেখে আসুন এই বিশেষ বিয়ের বিশেষ অনুষ্ঠানটি।

এখানে বিয়ে একটা ব্যবসা। পূঁজি ছাড়া। না, কথাটা ঠিক হলনা। পূঁজি লাগে। দেহ পূঁজি। কিছু আমেরিকান মহিলা আছে তারা এই এশিয়ানদের প্রয়োজন সম্মন্ধে বিশদ জেনে গেছে। এশিয়ান যাদের কাগজ নেই তারা বিয়ে করে কাগজের ব্যবস্থা করে। বিশেষ করে বাঙালীরা। তাদের প্রয়োজনটাই বেশি। যেভাবেই হোক তাদের কাগজ চাই। কাগজ পাবার সব রাস্তাগুলো চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে শেষ চেষ্টা বিয়ে। যে কোন একজন আমেরিকানকে বিয়ে করে কাগজ পাবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থাটা কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ নামে পরিচিত। এর অনেক রকম নিয়ম কানুন আছে। ব্যক্তিবিশেষে নিয়ম বদল হয়। কন্ট্রাক্ট করার সময় তাদের কথাবার্তা হয়। পাঁচ হাজার ডলার থেকে উপরের দিকে যে যত পারে আদায় করে। নিজেদের ইচ্ছেমত শর্ত আরোপ করে। কেউ বিয়ে করে শুধু কাগজে পত্রে, কেউ লিভ টুগেদার করে বা করতে হয়। কেউ

আসলেই বিয়ে করে, সংসার করে। সেখানে টাকার লেনদেনের প্রয়োজন পড়েনা। শান্তি সুখের প্রয়োজন হয়। কিছু আফ্রিকান আমেরিকান মহিলা এ ব্যবসাতে বেশ উন্নতি করেছে। কোন কোন মহিলা এক সাথে একের অধিক স্বামীকে স্পন্সর করেছে। আদালতে ধরা পরেছে। অনেক আমেরিকান মহিলা আছে যারা বাঙালীর সংস্পর্শে এসেছে এবং ধারনা হয়েছে যে তারা বিয়ে করে কিছুদিন মজা করে ফেলে চলে যায়না। তাই সত্যিকার বিয়ে করে অনেকেই সুখে সংসার করছে। আবার কেউ আছে বিয়ের কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গেলেও স্ত্রীর দাবী থেকে রেহাই পায়নি। যখন তখন টাকার দাবী মেটাতে হয়। আবার কেউ আছে কন্ট্রাক্ট শেষে তালাক দিতে গেলে স্বামীর সম্পত্তি দাবী করে বসে অর্ধেক। এমন ঘটনাও আছে। এখন এই কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ করার আগে সব কথা পরিষ্কার করে নিতে হয়।

আহমদ আলীর কন্ট্রাক্ট হয়েছে এক আফ্রিকান আমেরিকান মহিলার সাথে। চার সন্তানের জননী এ মহিলা অনেক দিন থেকে এ ব্যবসায় নিয়োজিত। চার স্বামীর ঔরসে এই চার সন্তান। তার অনেক অভিজ্ঞতা। আহমদ আলীকে শর্ত দিয়েছে, নগদ পাঁচ হাজার ডলার দিতে হবে, দু'বছর তার সাথে থাকতে হবে স্বামী স্ত্রী হিসাবে। মহিলার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে, এখন ইমিগ্রেশন খুব কড়া ইন্টারভিউ নেয়। তাতে গোপন অনেক প্রশ্ন থাকে। যেমন যৌন কর্মের উপর কিছু প্রশ্ন, গোপন স্থানের কোন চিহ্ন। আগে এসব ছিলনা। এই কন্ট্রাক্ট ম্যারেজের কথা ইমিগ্রেশন জেনে গেছে। তাই সামান্য একটু খুঁত পেলেই দরখাস্ত বাতিল হয়ে যায়। এই মহিলার এক স্বামীর কাগজ হয়নি। কারন সে বলতে পারেনি কিভাবে যৌনকর্ম করলে তার স্ত্রী খুশী হয়। একই প্রশ্ন দু'জনকেই করে। না মিললে দরখাস্ত বাতিল। তাই এই মহিলা শর্ত দিয়েছে দু'বছর পর্যন্ত তার সাথে থাকতে হবে। স্বামীর যে দায়ীত্ব তা পালন করতে হবে। যখন তখন বাজার সওদা করতে হবে। ছেলেমেয়েদের সাথে পিতার মত ব্যবহার করতে হবে। এই শর্ত কাগজ পাবার সুবিধার্থে।

এই পাত্রী আগেও এক বাঙালীর স্ত্রী হয়েছিলেন। তখন একসাথে থাকার শর্ত ছিলনা। এখন শর্ত যোগ হয়েছে। কি জানি কি কারন! হয়ত মহিলার বাঙালিকে ভাল লেগেছে। তাছাড়া আহমদ আলীর দেহখানা নাদুসনুদুস যেমন মসজিদের ইমাম বা বাড়ীর মুন্সীদের হয়। মুখে পাতলা দাঁড়ি। গায়ের রং শ্যামলা। এই চেহারাতে মহিলার একটু লোভ থাকতেই পারে। আহমদ আলী তাতেই রাজি। বিয়ে হয়ে গেল একটা চার্চে। খৃষ্টান মতে। কিভাবে কোন ফতোয়ার বলে এই শাদী হল, এটা ঠিক জানা যায়নি। যদি মুতা ম্যারেজ হয়ে থাকে তাহলে ইসলামি কায়দায় বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। সেখানে একজন মৌলভী থাকা উচিত ছিল। কিন্ত আহমদ আলীর বিয়ে হয়েছে একজন পাদ্রীর উপস্থিতিতে, খৃষ্টান মতে। বিয়েতে যা বলে বিয়ে পড়ানো হল তার বাংলা তরজমা করলে ইসলামী নিয়মের কাছাকাছিই অর্থ দাঁড়ায়। এ বিয়ের নিয়ম হল বিয়ে পড়ানো হয়ে গেলে স্বামী স্ত্রী একজন আর একজনকে চুমো দিবে।

পাত্রীর একটু নমুনা পাঠককে না দিলে আপনাদের খায়েস থেকে যাবে। পাত্রীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেহের সাইজ একটা ছোট হাতির মত। তিনি বোধ হয় সোমালি বংশোদ্ভুত। যাদের নিতম্ব এত বড় হয় যে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। কি জানি প্রকৃতির কি নিয়ম। দুলহীনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। গায়ের রং একবারে আলকাতরা। চেহারা হুবহু শিম্পাঞ্জী। উপায় নেই। অনেক খুঁজে, সৈয়দ

সাহেবের মাধ্যমে এই পাত্রির সন্ধান মিলেছে। কোন রকমে দু'বছর পার করে দিতে পারলেই হল। একেবারে আমেরিকান নাগরিক। কিন্তু গোল বাঁধল বিয়ে পর পরই।

নিয়ম অনুযায়ী বিয়ের পরই স্বামী স্ত্রী একজন আর একজনকে চুমো দিবে। বিয়ে পড়ানো শেষ হলে পাদ্রী বলল, এখন একজন আর একজনকে চুমো দাও। তখন দুলা দুলহীন একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরে ঠোটে ঠোট লাগিয়ে খুব কষে চুমো দিল। চুমো শেষ হতেই দুলহীন তার হাত একটু আলগা করতেই আহামদ আলী অবশ হয়ে ঢলে পড়ে গেল।

বিয়ের বরযাত্রী ছিল সাদেক আলী,শফিউল্লা আর আহম্মদ আলীর রুমমেট ছমিরউদ্দিন। না, এখানে বরযাত্রী কথাটা ঠিক নয়। কারণ ইনারা শুধু পাদ্রীর সামনে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখছিলেন। কিছু বলার বা করার ছিলনা। বিরিয়ানী জাতীয় কোন খাবারের ব্যবস্থা নেই। সৈয়দ সাহেবের সময় নেই বলে তিনি থাকতে পারেননি। বয়স অনুপাতে ছমিরউদ্দিনকে আহামদ আলী চাচা বলে ডাকে। এখানে ছমিরউদ্দিনই তার অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত আছে। আহামদ আলী ঢলে পড়ে যাবার সাথে সাথে ছমিরউদ্দিন দৌড়ে কাছে এল। কি হল! চলেই গেল নাকি! তখনই বলেছিলাম খৃষ্টান মতে বিয়েটা করা হারাম। ইসলামী আইনে বিয়ে না হওয়াতেই কি এমন হল! আহামদ আলী বলেছিল ইসলামী মতে বিয়ে হোক। কিন্তু পাত্রী রাজী হয়নি। এর শাস্তি হাতে নাতে পাওয়া গেল! তার উপর আল্লার গজব পড়েছে। এখন উপায়! সাদেক আলীর হাতে একটা পানির বোতল ছিল। তার আবার ডায়াবেটিস। সব সময় পানি রাখে সাথে। সাদেক আলী এগিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে বোতল থেকে তার মুখে পানি ছিটা দেবার পর চোখ খুলল। ছমিরউদ্দিন জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ এমন হল কেন ভাতিজা?

আহম্মদ আলী বলল, মাগীর মুখে এমন বিশ্রি দুর্গন্ধ যে হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল।

মাগী তো আর বুঝেনি বাংলায় কি বলল। যদি বুঝত তাহলে তখনই কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেত।

ছমিরউদ্দিন জিজ্ঞেস করল, তাহলে দুবছরের কি হবে?

ব্যবস্থা একটা করতে হবে চাচা!

তাহলে আজ থেকেই শুরু হবে?

তাছাড়া আর উপায় কি? কিছু দামী সুগন্ধী সাথে রাখতে হবে, তাকেও কিছু উপহার দিতে হবে। মনে করব দু'বছর জেলে আছি।

ছমিরউদ্দিন বলল, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। আজ আমিও চলে যাচ্ছি শফিউল্লার বাসায়।

বলা বাহুল্য, ছমিরউদ্দিন এখন একা এক রুমের ভাড়া দিতে পারবেনা। তাই শফিউল্লার বাসায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। শফিউল্লা বরবাদীর মাধ্যমে এদেশে এসেছে বছরখানেক হল। ফাজিল পাশ। ইসলামিক কায়দা কানুন যথেষ্ট রপ্ত করা একজন বক্তা। বয়স তিরিশের কোঠায়। সৌদি পোষাক তিনি পছন্দ করেন। মাথায় একটা সৌদি রুমাল সব সময় থাকে। স্ত্রীর বয়স একুশ বাইশ। মেট্রিক পাশ। কোন ছেলেপুলে নেই। থাকে এক বেড রুমের একটা বাসায়। কাজ করে একটা ফ্যাক্টরিতে। কাজের সময়ের ঠিক নেই। কোনদিন সকালে, কোনদিন বিকালে, কোন দিন রাতে। মোট কথা চব্বিশ ঘন্টার যে কোন সময় তার কাজ থাকতে পারে। তিনি তার স্ত্রীকে যথেষ্ট পর্দার ভিতর রাখেন। বোরখা ছাড়া বের হন না। আবার বোরখারও রকম আছে। এ

বোরখায় মুখ খোলা থাকবেনা। চোখও দেখা যাবেনা। শুধু পর্দার ভেতর দিয়েই পৃথিবীটাকে যতটুকু দেখা যায় বা ভোগ/উপভোগ করা যায়। কাজে যাবার সময় শফিউল্লা স্ত্রীকে বলে যায়, দরজা বন্ধ করে দাও। কেউ বেল বাজালে খুলবেনা কোন অবস্থাতেই। দরজায় নক করলে কোন আওয়াজও করবেনা। ঘরে কোন মানুষ আছে তা যেন বাইরে থেকে কেউ টের না পায়।

মাসকয়েক যাবত স্ত্রী মারুফা যেন কেমন হয়ে গেছে। বোরখা পরতে চায় না। বলে, এখানে তো কেউ বোরখা পরেনা। আমি বোরখা পরে বের হলে অদ্ভুত লাগে। মানুষ অন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। হাদিস কোরাণের বাণী মন দিয়ে শুনতে চায় না। কেমন যেন একটা উড়াল উড়াল ভাব। এখন অনেক কথা বলে, কথার পিঠে কথা বলে। মাঝে মাঝে তর্ক করে। 'স্বামীর পায়ের নীচে বেহেসত' কথাটা তার তেমন ভাল লাগেনা। নামাজ সময় মত পড়েনা। শফিউল্লা যখন ঘরে যায় তখন আগের মত আর খেদমত করেনা। তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনা, নামাজের মসল্লা ঠিক করে দেয় না। সব সময় বাইরে ঘুরতে চায়। ঘরে বসে শুধু টিভি দেখে। যেসব দেখা বেশরমের কাজ। যৌন উত্তেজক। এসব বেদায়েত কাজের জন্য স্ত্রী শাসনের যে ইসলামিক আইন আছে তা এদেশে প্রয়োগ করা যাবেনা তা শফিউল্লা জানে। তাই সে মানসিক ভাবে শাস্তি দিচ্ছে। ইসলামিক আইনের প্রথম ধারা অনুযায়ী বিছানা আলাদা করে দিয়েছে। এই কয়েক মাসে একবারও মনে হয়নি মারুফার কোন পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্বাসই করা যায় না এই মারুফা সেই মারুফা! এ নিয়ে শফিউল্লার মনে খুব কষ্ট।

শফিউল্লা নিজেই বলেছিল ছমিরউদ্দিনকে। শুনে ছমিরউদ্দিন বলেছিল, চিন্তা করো না ভাতিজা। আমি থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাকে একটু বোঝাতে হবে। সে ত আমার মেয়ের মত। আমি বুঝিয়ে ঠিক করে ফেলব। বয়স কম। মাঝে মাঝে এ রকম হয়। পরে সব ঠিক হয়ে যায়। কোন চিন্তা করোনা।

তাই শুনে শফিউল্লা একটু আশ্বস্ত হল। চাচা একজন অভিভাবক হিসেবে থাকলে অনেক উপকার হবে। তাই চাচাকে তাদের লিভিং রুমে থাকার ব্যবস্থা করেছে। থাকা খাওয়া সহ দু'শ ডলার দেবে প্রতি মাসে। বাড়ী ভাড়ার অঙ্ক মিলানোর জন্য এই টাকার প্রয়োজন। একা কাজ করে ভাড়া দিয়ে খুব টানাটানিতে চলতে হয়। এখন অঙ্কটা একটু সহজ হবে। তাছাড়া মারুফাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠিক আল্লার পথে আনায় সাহায্য হবে। শফিউল্লাহ যখন শুনল যে আলী আহামদ চলে যাচ্ছে নব বধুর ঘরে এবং ছমির চাচা বাসা খুজছে তখন শফিউল্লা নিজেই প্রস্তাব দিয়েছিল। বলছিল, চাচা, আপনি আমার এখানে চলে আসেন। লিভিং রুম তো আমাদের দরকার হয়না। আপনি ইচ্ছা করলে লিভিং রুমেই থাকবেন। প্রস্তাব শুনে ছমিরও খুব খুশি। কোন রান্নাবান্না ঝামেলা নেই। আরামে থাকা যাবে।

সেদিনই ছমিরউদ্দিন গিয়ে শফিউল্লার বাসা উঠল। কার রিজিক কোথায় লেখা আছে কেউ জানে না! রিজিক দেনেওয়ালা আল্লাহ মালিক!

ক্রমশঃ...